রাঙা ভাঙা চাঁদ

প্রতিভা বসু

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

আবু সয়ীদ আইয়ুব
গৌরী আইয়ুব
যুগলকরকমলে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখিকার অন্যান্য বই

আলো আমার আলো

আন্তোনিনা

অপেক্ষাগৃহ

পদ্মাসনা ভারতী

ঈশ্বরের প্রবেশ

সকালের সুর সায়াহ্নে

সমুদ্র পেরিয়ে

সমুদ্র হৃদয়

সোনালি বিকেল

অতলান্ত

হৃদয়ের বাগান

দ্বিতীয় নক্ষত্র

অগ্নি তুষার

রাঙা ভাঙা চাঁদ

উপক্রমণিকা

॥ ১ ॥

'উগো, বাবাগো, মাগো, মেইরে ফেলছে গো।'

রাত্রির নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে যুধিষ্ঠিরের মায়ের প্রচণ্ড গলা পাড়ার এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলো।

ধুপছায়া গ্রামের কৈবর্তপাড়ায় এই রকম চিৎকার চ্যাঁচামেচি কিছু নতুন নয়, ঝগড়া মারামারি এদের জলভাত, এদের অবসর বিনোদনের একটি অন্যতম উপায়। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মায়ের পক্ষে এই ধরনের কাতর আর্তনাদ সেটা নতুন, অপ্রত্যাশিত। কেননা তার মতো প্রবল শক্তিশালী ঝগড়াটে সেই তল্লাটে তো বটেই, সেই গ্রামেই খুব কম। যেমন তার গলায় জোর, গালিগালাজের ক্ষমতাও তেমনি অসীম। এই জন্য তাকে বড়ো একটা কেউ ঘাঁটায় না। তার সঙ্গে যুঝতে পারে এমন কলিজার জোর বলতে গেলে একমাত্র কাদুবালার ছাড়া আর কারোই নেই।

কাদুবালা যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাতি খুড়ি। বাতাসে পাতাটি নড়লেও সে পায়ের বুড়ো ন'খ ভর দিয়ে ডিঙি মেরে এতোখানি উঁচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, হস্তের ঝাঁটা মুঠো ক'রে ধ'রে, সারা শরীরের সব কাপড় কোমরে গুঁজে, দাঁত কিড়মিড় ক'রে 'ক্যাড়া' বলে নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে চক্ষে আগুন ছুটিয়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু আজ ক'দিন যাবত তার বেশী সাড়াশব্দ নেই। একটা গর্হিত কর্ম ক'রে সে ঈষৎ দমিত হ'য়ে আছে। দিন সাতেক আগে সন্ধ্যাবেলা তার একমাত্র পুত্রবধূ রঙ্গেশ্বরী যখন ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছিলো, তখন হাঁড়ি ভরতি ভাত ফুটছিলো উনুনে। কাদুবালা রান্নাঘরের দাওয়ায় চাঁদের আলোয় বসে সুপুরি কাটছিলো, চিৎকার ক'রে বৌকে ডাকলো, 'বলি ও নবাবের বিটি, এই সাঁঝবেলায় আবার কোন ভাতারের সঙ্গে শুতে গেছিস লো?'

শাউড়ির সুমধুর সম্ভাষণের জবাবে রঙ্গেশ্বরী তিক্ত গলায় জবাব দিলো,
'ক্যানে, তাতে তোমার কী দরকার?'

'ইদিগে যে ভাত পোড়া গন্ধ ছেইরেছে সিদিগে নজর আছে? হারামজাদীর আবার চোপা ত্যাখোনা।'

সাতমাস পোয়াতি বৌ, সদ্য বিধবা. বয়েস কুড়ি, এই নিয়ে তৃতীয় সন্তানের জননী হ'তে চলেছে। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই, মুখে রুচি নেই, রাত্রে ঘুম নেই। খাটুনি সাড়ে ষোলো আনা, মেজাজ প্রায় ছিলে-বাঁধা ধনুকের মতো টান টান হ'য়ে আছে. সহ্যের সীমার প্রান্তে এসে গলা চড়িয়ে দিলো সে, 'নজর কি কেবল একজনেরি থাইকবে? ক্যানে, আমি কি মনুষ্য না? আমার শইলে কি শ্বাস বয় না? না কি ভাতের পানারা একা আমিই মারি। বইসে বইসে সুপারি ফালা না দিইয়ে ভাতটা নামালেই তো হয়।'

'কী, কী বললি?'

'ঐ যা বললাম, বললাম।'

'আবার বল, আবার আমি তর মুয়ে শুনি, গুরুজনেরে অছেদ্দা করা তোর বার করি।'

'আরে আমার গুরুজনরে, ঐ যা বুলছি শুইনে লও, বাক্যি আমি দু'বার ছুটাই না।'

'তবে লো ভাতারখাগি, মরকুনি'—এক লাফে কাদুবালা কোমর বেঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালো, এক পলকে ধন্দুমার বাঁধিয়ে দিয়ে হাতের সুপুরি কাটা জাঁতি ছুঁড়ে মারলো বৌকে তাক ক'রে। আর দেখতে হ'লো না। ধার অংশটা কপালের বাঁ পাশে আধখানা ডুবে গিয়ে কাঁপতে লাগল থর থর ক'রে। মুখ দিয়ে শব্দ বার হবার আগেই ঢলে পড়লো মেঝেতে। ছেলেটা চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো, ঘরের কুপি জ্বলা আধো অন্ধকারে রক্তের ঢেউ দেখে তখুনি থেমে গেল আবার। কাদুবালার গলাও থামলো। এতোটা ভাবেনি সে। মুহূর্তের জন্য একটা শিহরণ খেলে গেল বুকের মধ্যে। তারপরেই দৌড়ে গিয়ে লেপ কাঁথা দিয়ে ঠেসে ধরলো বৌকে। কে কোথায় রক্ত

দেখে ফেলবে ঠিক আছে কিছু? লাস নিয়ে তখন টানাটানি। আর মানুষ খুন করলে যে ফাঁসি হয় এ সংবাদ কাতুবালাও জানে।

॥ ২ ॥

এরপরে ঝাঁপ পড়লো ঘরে। কাক পক্ষিটি টের পাবার আগেই মৃতদেহ পোড়াতে নিয়ে যাওয়া হ'লো। কাতুবালার স্বামী ঝরু কৈবর্ত গাঁয়ের মধ্যে ডাকসাঁইটে লোক। তার জমি জায়গা বেশী, টাকাকড়ির জোর আছে, অন্যান্য মোড়লদের জুটিয়ে একেবারে ধামাচাপা দিয়ে দিলো ব্যাপারটা। হাজার হোক, শাশুড়িই তো মেরেছে। ঘরে ঘরেই বেয়াদপ বৌদের এভাবে শাসন করা হয়, অমন টপ ক'রে মরে গেলে কি চলে?

প্রাণহানি আর কে চায়? কাতুবালাই কি চেয়েছিলো? বেয়ারা মাগীকে একটু সজুত করাই উদ্দেশ্য ছিলো তার। তা সে যদি তাতেই অক্কা পায় সেটা তারই দোষ, জ্যান্ত থাকলে কাতুবালা তার হাড়মাস একত্র থাকতে দিতো না এই অপরাধের জন্য। কিন্তু তাই বলে পুলিশ ডেকে এনে যে এরা কেউ জানাজানি হ'তে দেবে না ব্যাপারটা এটা জানা কথাই। কেঁচো খুঁড়তে তো তখন সাপ বেরিয়ে যাবে। কৈবর্তপাড়ায় তো একটাই কাতুবালা নেই। একের নামে লাগাতে গেলে দশের নাম বেরিয়ে পড়ার ভয় এদের সকলের বুকে। অনেক কাতুবালাকেই তখন আইনের ফাঁসে এদের জড়াতে হবে। আর কাতুবালার যদি কিছু হয়ই সত্যি, পুলিশ টের পেয়ে যদি ধ'রে নিয়েই যায়, সেই কি কারোকে ছেড়ে কথা কইবে, তেমন বাপের বেটিই নয় সে। একা সে যাবে না, ডুবলে গুষ্টি সুদ্ধু ডুবিয়ে যাবে। এবং সেটা সে আড়ে ঠাড়ে শোনাতেও ছাড়েনি কাউকে। তারপর এক গগন-বিদারণ চিৎকার দিয়ে কাঁদতে বসেছে মৃত বধূর জন্য।

যারা মড়া পোড়াতে গিয়েছিলো, তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো, 'আরে, এ দেখছি এখনো গরম। ব্যাপার কী রে।'

একজন বললো, 'চেপে যা, চেপে যা।'

আর একজন বললো, 'ত্যাখ, ত্যাখ, কণ্ঠার কাছটা কীরকম ধুকধুকাইছে।'

কাত্থবালার স্বামী দৌড়ে এসে কয়েকটা বোতল এগিয়ে দিলো হাতে, সবাই চুপ ক'রে গেল।

কিন্তু খবর ছোটে বাতাসের আগে। পরের দিন সকালেই আছড়াতে আছড়াতে তার বাপ মা এসে হাজির। 'আমার অঙ্গেশ্বরী কই, তোমরা তাকে কোথায় লুকোলে।'

কাত্থবালা মুখ বাঁকিয়ে বললো, 'আ মোলো যা, এখন এয়েছেন অং দেখাতে। কাল ছিলি কুথায় শুনি। এই যে বৌ ওলাওঠা হইয়ে বেঁহুস মেইরে চইলে গেল, গু মুত কাঁচতে কি তোরা ছিলি, না আমি? আমার বলে বুক জ্বইলে যাচ্ছে।'

এই বলে সে বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলো রঙ্গেশ্বরীর দুঃখে। প্রতিবেশীরা এসে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কান্না থামিয়ে সেই শোকে সান্ত্বনা দিতে বসলো। ঝরু লাল চোখ ক'রে বললো, 'আগে আসতে পারলে না? তোমরা আসবে বলে তো আর মরা বাসি ক'রে ফেলে রাখতে পারি না। তাই রাতারাতিই পুড়িয়ে দিয়েছি।'

সুতরাং সেই কাত্থবালা যখন ঘরে বসে প্রদীপের আলোয় পলতে পাকাচ্ছে তখন আর কার সাধ্য হ'লো যুধিষ্ঠিরের মা মঙ্গলীকে আহত করার? তার গলায় তো এই আর্তনাদ উঠবার কথা নয়। ওঠেওনি কোনোদিন।

এমনিতেই এদের জীবন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। সন্ধ্যে লাগলো কি খেয়ে দেয়ে কুপি নিবালো, তার উপরে এখন হেমন্ত কালের ঠাণ্ডা, আর তারও উপরে রঙ্গেশ্বরীর মৃত্যুর ছমছমানি। সবটা মিলিয়ে সব ঘরেই ঝাঁপ পড়ে গিয়েছিলো। পাড়াটা চাপা নয়, দূরে দূরে ঘর। একমাত্র কাত্থবালার ঘরই সবচেয়ে কাছে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের

মায়ের গলা কাছে দূরে সকল ঘরের দরজাই ভেদ করলো। লাফিয়ে অবিশ্যি সর্বাগ্রে কাহুবালাই উঠতে যাচ্ছিলো, কী ভেবে থামলো। অন্ধকারে দরজা খুলতে ভয় করলো তার। চোর-তস্কর সাপ-খোপের ভয় নয়, ভূতের ভয়। অঙ্গেশ্বরীর ভূতের ভয়। হারামজাদী যে পেত্নী হ'য়ে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করছে না কে জানে। আর এ সব হ'লো অপমিত্যুর মরা, ঘাড় মটকাতে কতোক্ষণ। আর যতো রাগ নিশ্চয়ই তার উপরই বেশী।

তাই এতোবড়ো একটা মুখরোচক, শ্রবণবিনোদক চিৎকার শুনেও বেরুতে পারলো না কাহুবালা। কিন্তু কী হ'তে পারে? মন তার কাজ করতে লাগলো। তবে কি এতোদিনে একটু সুমতি হয়েছে যুধিষ্ঠিরের। মাকে বেশ ভালো হাতে কয়েক ঘা লাগিয়েছে? নইলে মেইরে ফেলছে বলবে কেন? ভেবে আরাম হ'লো কাহুবালার। ঐখানে বসে বসেই সে ঘাড নেড়ে নেড়ে বিড় বিড় করলো, 'আরো দে দু' ঘা, মাগীর রস এট্টু কমুক। ক'দিন ধ'রে বড়ো বাড় বেড়েছে। কথায় কথায় খোঁটা দেয়!'

কিন্তু তা নয়। একটু পরেই কাহু টের পেলো, তা নয়। গন্ধে গন্ধে বুঝে ফেললে এ হচ্ছে শাউড়ি বৌয়ের ঝগড়া। বৌটা তো কাদার ডেলা, ওটাকে তো ওরাই সারাদিন চটকায়। ও আবার শাশুড়িকে কী করবে? ওর সাধ্য কী। কুন্দুলনী কপালগুণে বৌ পেয়েছে বটে। মুখে একটু শব্দ নাই গো? মারো কাটো ছ্যাঁচো, চুপ। অমন ঘাগি বদ সোয়ামী আর আগুনের কুণ্ডু শাশুড়ি নিয়ে কেমন নিশ্চুপে ঘর করে যে দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। সারাদিন কী খাটুনিটাই খাটে। মঙ্গলী তো বৌ এসেছে পর থেকে দিঘালী কুটাগাছ পাথালি করে না, বসে বসে কেবল ফরমাস। একটু ইদিক উদিক হ'লো কি মার। তার উপর যুধিষ্ঠিরটা মারে না? বৌ সুন্দর বলে তো সারাদিন সন্দেহ। কোনোদিন তো বৌটা কথা বলে না, আজ তবে কী হ'লো? স্বামীকে ঠেললো কাহুবালা। 'উঠছোনা কেনে? যুধিষ্ঠিরের মাটাকে যে মেইরে ফেলছে গো।'

'হঃ, যুধিষ্ঠিরের মাকে আবার কেউ মাইরবে।' ঝরু কৈবর্ত ভালো ক'রে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরলো, 'নে, চুপ ক'রে থাক, যা করতিছিলি কর, ঠাণ্ডায় আমার হাড় কাঁপাইছে, এখন আমি উঠতে যাই আর কি। কেউ যদি মারে তো মেইরে ফেলুক, আপদ চুকুক।'

॥ ৩ ॥

কিন্তু উঠতেই হ'লো শেষ পর্যন্ত। হাজার হোক, জ্ঞাতিঘর, কর্তব্য আছে। আর যুধিষ্ঠিরের মা-ও সহজে থামলো না। সেই সঙ্গে যুধিষ্ঠির আর যুধিষ্ঠিরের নবলব্ধ বড়োলোক বন্ধু তেলকলের ঘনশ্যাম মণ্ডলের হেড়ে গলার স্খলিত অশ্রাব্য কুশ্রাব্য গালিগালাজের আওয়াজে পাড়া আলোড়িত হ'তে লাগলো। আর সকলের মিলিত আক্রোশের একমাত্র উদ্দেশ্য যে যুধিষ্ঠিরের ছেলেমানুষ বৌ কুসুম, সে বিষয়ে সন্দেহ রইলো না কারো।

যুধিষ্ঠিরটা মানুষ না, তেমনি বন্ধুও জুটিয়েছে একটা। যুধিষ্ঠিরের বৌয়ের জন্য অনেকের মনেই একটু মমতা ছিলো। মেয়েটা এ পাড়ার ব্যতিক্রম, যেমন চেহারায়, তেমনি চরিত্রে। এ পর্যন্ত কেউ তাকে গলা তুলে কথা বলতে শোনেনি, ঝগড়া করতে দেখেনি। এমন লক্ষ্মীমেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। হঠাৎ সেই বৌ কি আজ ক্ষেপে গেল নাকি? পাগল হ'য়ে গিয়ে আচ্ছা ক'রে ঠেঙালো নাকি শাশুড়িকে। কর্তব্যের চেয়ে শেষে সকলের কৌতূহলটাও কম জেগে উঠলো না। অগত্যা, যেন এইমাত্র শুনেছে, শুনেই ছুটে এসেছে, এইরকম ব্যস্তসমস্তভাবে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সব।

'কী হলছে গো, কী হলছে? অগো কী হলছে?'

সাহস পেয়ে এইবার কানুবালাও বেরুলো, খুদে খুদে ক্ষয়ে যাওয়া সাদাপাতা খাওয়া কালো কালো দাঁতে হাসির ঝিলিক লাগিয়ে ডিঙি মেরে বললো, 'বলি অ যুধিষ্ঠিরের মা, ছেরটা দিন তো তুমিই গুষ্ঠিকে মা বাপ ডেইকিয়ে ছেইরেছ, আজ তুমাকে কে ডাকাইল গো? কলির বাতাস কি উল্টে গেল নাকি? বুলি বৌটাকে কি উন্মাদ কইরে

'ছাড়লে ? না কি ডাকাইত পইরেছে ঘরে ?'

এতো কথার পরেও যুধিষ্ঠিরের মা আজ লাগসই জবাব দিতে ছুটে এলো না। মাটিতে পড়ে দাপাচ্ছে সে, 'অগো মেইরে ফেলছে গো, একেলে মেইরে ফেলছে। তোমরা কে কুথায় আছ গো. হাবামজাদীকে চুলের মুঠি ধইরে নিয়েসো, হারামজাদীকে আমি জ্যান্ত পুঁইতবো। অরে অ যুধিষ্ঠির, অরে অ কালসাপ. যদি মাতত্তিহত্যার পাপে ডুইবতে না চাস, যা। দৌড়ে যা। দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে কী দেখছিস ? মাগীরে ধর, পুলিশ ডেইকে নিয়ে আয়, আমারে লুইকে থুয়ে বল আমি মইরে গিয়েছি। হারামজাদীর ফাঁসি হোক। অগো পোড়াকপালী যে আমারে খুন কইরে পেইলে গেল গো।'

যুধিষ্ঠিরের মায়েরও রঙ্গেশ্বরীব মতো কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে, গালে মুখে লেপটে গেছে, দেখে হঠাৎ কেমন ভয় ক'রে উঠলো কাত্তবালার।

সচেতন হ য়ে এতোক্ষণে যুধিষ্ঠির বাঁশচাছা দা নিয়ে দৌড়োদৌড়ি ক'রে বৌকে খুঁজতে লাগলো—কুপিয়ে মেরে ফেলবে বলে। ধেয়ে গেল ঘরের মধ্যে, গেল পুকুর ধারে, গোয়াল ঘরে উঁকি মারলো, ছাঁদনাতলায় গেল ; নেই, কোথাও নেই।

তবে কি যুধিষ্ঠিরের সুন্দরী বৌ পালিয়ে গেল বড়োলোক ঘনশ্যামের সঙ্গে ? ওটাই তো ক'দিন ধ'রে কেমন সন্দেহজনকভাবে ঘোরা-ফেরা করছে এ বাড়ির মধ্যে। কিন্তু বৌটা তো দেখতে পারতো না লোকটাকে। এলেই গলা পর্যন্ত ঘোমটা টেনে প্রতিবেশীদের ঘরে লুকোতো গিয়ে। আর তা ছাড়া ঐ তো সেটা ! নেশা ক'রে চুর হ'য়ে বমি করছে দাওয়ায় বসে আর যুধিষ্ঠিরের পিতৃপুরুষের নাড়িভুঁড়ি টেনে আনছে মুখের দরজা দিয়ে।

পাড়ার বৌ-ঝিরা মাটি থেকে তুলে যুধিষ্ঠিরের মাকে ঘরে নিয়ে এলো, জল ন্যাকরা দিয়ে কপালের রক্ত মুছিয়ে পটি বেঁধে দিলো। শোনা গেল একটা বাঁশ দিয়ে মাথায় বাড়ি দিয়েছে কুসুম, কপাল ফেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে, একটু জোরেই লেগেছিলো আঘাতটা। কিন্তু

সেজন্যে নয়, শারীরিক কষ্টে কাতর হ'য়ে নয়, বৌ হ'য়ে সে শাশুড়িকে মেরে পালিয়ে সারলো সেই আক্রোশটাই প্রবল হ'য়ে তাকে কষ্ট দিচ্ছিলো বেশী। সেই যন্ত্রণাতেই সে সমানে চিৎকার করতে লাগলো, আঙুল মটকে মটকে শাপমন্যি করতে লাগলো, বলতে লাগলো— তুই যাবি কোথা ছাইকপালী, ইন্দুরের মতো খাঁচাকলে ধইরে আইনবো তোকে, তোকে ছেঁচবো কুটবো ভাজবো, আছড়ে মেরে ছেরাদ্ধ খাবো। তোকে অঙ্গেশ্বরীর মতো শ্মশানে নে গে জ্যান্ত পুড়াবো।

যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাতি খুড়ো বিধান দিলো, 'চেঁইচে মেইচে কী লাভ? নেতাইয়ের বাড়ি যাও, নেতাইয়ের বাড়ি যাও। দেখগে সে সেইখেনেই লুইকেছে। বাপের ঘর ছাড়া কুথা যাবে আর। বৌ হইয়ে শাউড়িকে মেইরেছে এর প্রিতিবিধান কইরতেই হবে। হ, জানি বৌটা ভালো ছেলো, কষ্ট পেইতে পেইতেই ক্ষেইপে অকম্ম কইরে ফেলেছে, তবুও শাসন দরকার। নইলে গেরামের অন্য বৌ-ঝি খারাপ হইয়ে যাবে।'

কিন্তু যাবে কে? নেতাইয়ের বাড়ি কম দূর নয় এখান থেকে। যুধিষ্ঠিরেব কি পা চালাবার ক্ষমতা আছে? না কি মগজেই আছে কিছু? উঠোনে দাঁড়িয়েই সে রামায়ণের রাম হ'য়ে কল্পিত তীব ধনুকে টঙ্কার দিয়ে শত্রুসংহার কবতে লাগলো। হঠাৎ বন্ধুটা লাফিয়ে উঠে বললো, 'দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও, এই আমিই যাচ্ছি, প্রেয়সীকে আমিই টেইনে আনছি, এক্কেবারে বুউকে কইরে নিয়ে আইসবো, দাঁড়াও—' বলতে বলতেই টলে পড়লো, জড়ানো গলা ভেউ ভেউ ক'রে উঠলো কান্নায়, 'এট্টুখানি চুমা খেইয়েছি বইলেই এতো মান তোমার, ওহো হো হো—'

'কী! কী বললি? শালা কী বললি?' মুখ থেকে বিড়ি ফেলে পাড়ার সবচেয়ে বখা ছেলে করাতকলের মিস্ত্রি লাটু তেড়ে এগিয়ে এলো, 'যুধিষ্ঠিরের বৌকে তুই চুমা খেয়েছিস? তোর ঠোঁট যদি আজ না কাটি তো আমার নাম লাটু নয়, আমার বাবার নাম পল্টু নয়।' গলার তাবিজে ঝমঝমিয়ে উঠলো সে।

পুরুষেরা চোখে চোখে ঝিলিক দিলো, মেয়েরা 'হক থুঁ' করলো, কুসুমের এই বিদ্রোহের মধ্যে যে ঘনশ্যামকে নিয়ে মস্ত এক কুৎসিত ব্যাপার জড়িয়ে আছে সকলের মনেই সেই সন্দেহ খেলে গেল।

কাদুবালা মুখ ঢুলিয়ে বললো, 'অ তাই বলো।'

লাটু পড়ে থাকা ঘনশ্যামের দেহপিণ্ডে কষে লাথি মারলো ছ'ঘা, তারপরে বুকে চাপড় মেরে বললো, 'কিচ্ছু ভাবনা নাই, সব ঘটনা আমি এখুনি জেইনে দিচ্ছি, তারপর তোর একদিন কি আমার একদিন। আর ঐ যুধা হারামজাদা, বন্ধুকে বৌর মুখ দেখিয়ে যেটা পয়সা লয়, সেটাকেও দেখবো।'

'এ্যাঁ, কী বললি?'

'বুলছি, সবই বুঝছি, আগে লিয়ে আসতে দে বৌটাকে, আগে শুইনেনি সব. তারপর বিহিত।'

যুধিষ্ঠিরেব বৌয়ের উপব নজর ছিলো লাটুর। তাকে দেখলেই তাব মুখে জল এসে যেতো। পাড়ার কোন পুরুষেরই বা না আসতো। কিন্তু মেয়েটা ডাকাত। মেয়েটা ঘেন্না করে তাদের। একটুও রঙ্গরস করবার উপায় নেই। আজ যদি বিধি বাম না হয় লাটুর কপালে নিশ্চয়ই অশেষ সুখ আছে। বাপের বাড়ি থেকে ধ'রে নিয়ে আসার সময়. এতোখানি নীরব নির্জন রাত্রির রাস্তা কি সে বিফলে যেতে দেবে? কিছুতেই না। পটের পুতুলের মতো মেয়ে, কতোক্ষণ লড়বে সে. কতোটুকু শক্তি আছে তার শরীরে যে লাটুর মতো একটা যোয়ানকে সে কাবু করবে? আহাহা, তারপর যে কী মজা! কী সুখ! সুখটা যেন সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খানিকক্ষণ উপলব্ধি করলো, তারপর জিব দিয়ে টাগরায় টোকা মেরে ছিটকে তুবড়ির মতো বেরিয়ে গেল।

যতোক্ষণে লাটু গিয়ে নেতাই দাসের ঘরে পৌছোলো ততোক্ষণে বেচারা কুসুম, সৎমার তাড়া খেয়ে আবার ছুটতে শুরু করেছে যেদিকে দু চোখ যায়। স্বামীর ঘরের চেয়ে পৃথিবীর সব জায়গা তার তখন

নিরাপদ মনে হচ্ছে, সব জায়গা সহনীয় বলে ভাবছে। বনে বাদাড়ে ঝোপে ঝাড়ে, মাঠ ঘাট আল বেয়ে ছুটতে ছুটতে হাত-পা ছিঁড়ে যাচ্ছে তার, কিন্তু তবু সে থামতে পারছে না, পালাতেই হবে। পালাতেই হবে। এই জঘন্য জীবন থেকে পালিয়ে যেতেই হবে, এ ছাড়া আর কোনো কথা ভাবছে না সে।

উন্মীলন

॥ ১ ॥

ভোরের আলো না ফুটতেই রওনা হ'য়ে গেছে সোমেন। তার ট্রেন ছাড়বে পৌনে পাঁচটায়। মহামায়া গোছগাছ ক'রে তাকে সাইকেল রিক্সায় তুলে দিয়ে শিথিল পায়ে আবার দোতলায় উঠে এলেন, এসে জানালায় দাঁড়ালেন, যতোদূর দেখা যায় দেখলেন, তারপর আঁচলে চোখের জল মুছে, বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লেন। বাড়ি-ঘর শূন্য হ'য়ে গেল।

তাঁর জীবনের এই একটি মাত্র ছোট্ট ঢেউ, এই একটি মাত্র আকর্ষণ। তাঁর ধুয়ে মুছে যাওয়া সাধ আহ্লাদের নতুন উদ্গমতার একমাত্র সন্তান সোমেন। এটিকে নিয়ে অতি অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন তিনি। সম্বল বিশেষ কিছুই ছিলো না, গ্রামের পক্ষে সৌখীন একটি বাড়ি, পিছনের দিকে দশ বিঘা জমি জুড়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক আম জাম কাঁঠাল কলার বাগান, আর বাঁধানো-ঘাট একটি মস্ত পুকুর। সবই অযত্নরক্ষিত ছিলো, জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই মূল্য ছিলো না সে সবের। কিন্তু বাড়ির সামনে উৎকৃষ্ট ফুল বাগিচা ছিলো একটি। ফুলের সখ এঁদের পুরুষানুক্রমে। আর সেই সখ তাঁর মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিলো। আসলে তাঁর স্বামী যা যা ভালোবাসতেন, বলতে গেলে সেই সমস্তকিছুর উপরেই তাঁর একটা উগ্র ধরনের

আসক্তি জন্মে গিয়েছিলো। সম্ভবমতো সেই সব পালনে তিনি তৎপর ছিলেন, অভ্যস্ত ছিলেন। এখন এই বাগান তাঁর প্রাণ, বাগান বাগান ক'রে নাওয়া খাওয়া ভুলে যান। বছর ভ'রে বাড়ি আলো ক'রে ফুল ফুটে থাকে ; কখনো ডালিয়া, কখনো চন্দ্রমল্লিকা, কখনো গোলাপ, যে সময়ের যা।

যতোদিন সোমেন কাছে ছিলো, সোমেনও মায়ের সঙ্গে খেটেছে এই বাগানের জন্য। আস্তে আস্তে যখন বড়ো হ'য়ে উঠলো, হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'লো, তারপর একদিন কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে মাকে প্রণাম ক'রে চলে গেল কলকাতার কলেজে পড়তে, তখন মহামায়া একা একাই বুক দিয়ে রক্ষা করেছেন এই বাগান, এই সাত বছরের নিঃসঙ্গ মহামায়া এই বাগানের নেশা নিয়েই সহ্য করেছেন ছেলের বিচ্ছেদ। ছুটিতে ছুটিতে যখন সে এসেছে মায়ের কাছে, বুকটা ভ'রে উঠেছে কানায় কানায়, আবার কলেজ খুলেছে, আবার চলে গেছে একা ক'রে। আবার তিনি মেতে উঠেছেন ফুলের পসরা নিয়ে।

কিন্তু দুঃখের দিন ফুরিয়ে এসেছে তাঁর। পড়াশুনো সাঙ্গ হয়েছে সোমেনের. একটা কলেজে অধ্যাপনার কাজও পেয়ে গেছে হাতে হাতে। কিন্তু ঐ সামান্য মাইনের উপর নির্ভর ক'রে এখুনি গিয়ে ছেলেকে বিব্রত করতে চাইছেন না তিনি। থাক, আর ক'দিন যাক, আরো একটু থিতিয়ে বসুক, তারপর তো আছেই যাওয়া। কিন্তু সোমেন আর মাকে ফেলে থাকতে চাইছে না, তাই পরিকল্পনা চলছে অল্প ভাড়ায় একটি বাসযোগ্য বাড়ি পেলেই সে নিয়ে যাবে তাঁকে। মহামায়াও লুব্ধ হচ্ছেন, ছেলের সঙ্গে থাকতে ব্যাকুল হয়েছেন, কিন্তু এখুনি না যাবার আসল কারণটা শুধুমাত্র আর্থিক আপত্তিটাই হয়তো বড়ো নয়, হয়তো এই শত-স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি ছেড়ে যাওয়াও কম কষ্টের নয় তাঁর পক্ষে। আর এই বাগান। বাগান দেখবে কে ? যে বাগানে এ বছর তিনি অনেক যত্নে অজস্র গোলাপ ফুটিয়েছেন,

যে গোলাপ তিনি আলিপুরের হর্ট-হাউসে পাঠিয়ে প্রাইজ পাবেন বলে আশা করছেন। এর আগের বছর তাঁর বাগানের ডালিয়া প্রাইজ পেয়েছিলো, তার আগের বছর চন্দ্রমল্লিকা। এ বছরের গোলাপও কি তাঁর ব্যর্থ হবে? তাই নানারকম দ্বিধায় দ্বন্দ্বে সময় কাটছে তাঁর।

॥ ২ ॥

ক্লান্ত ছিলেন, ভাবতে ভাবতে একটু বোধহয় তন্দ্রাই এসেছিলো, তারপরেই চমকে উঠলেন। হঠাৎ যেন কী রকম একটা শব্দ শুনে চটকা ভেঙে উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি, জানালা ফাঁক ক'রে তাকিয়ে দেখলেন তখনো হেমন্তের আকাশ কুয়াসায় মোড়া, তখনো আলোর রংয়ে লালের ছিঁটে পড়েনি। সোমেন চলে গেছে। আবার মনে পড়লো সে কথাটা, আবার ঝাপসা হ'লো চোখ। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই সে ট্রেণে উঠে বসেছে, ট্রেণ কি ছাড়েনি? ক'টা বাজলো?

সোমেন এসেছিলো পুজোর ছুটিতেই, কিন্তু থাকলো না, শুধু দেখা ক'রেই চলে গেল, বন্ধুর সঙ্গে পুরীর সমুদ্র দেখতে যাচ্ছে। সমুদ্রে মহামায়ার বড়ো ভয়, ছেলের মঙ্গলার্থে যুক্তকর কপালে ছোঁওয়ালেন তিনি, তারপর দরজা খুলে নেমে এলেন নীচে, একেবারে বাগানে। সেই শব্দটা তার ভালো লাগেনি, কে জানে কেউ ঢুকে ফুল ছিঁড়ছে কিনা। এসে দেখলেন গাছগুলো সকালের মৃদুমন্দ বাতাসে হিল্লোলিত হচ্ছে, পাতায় পাতায় শিশিরের ফোঁটাগুলো মুক্তোবিন্দু হ'য়ে টলটল করছে উঠি-উঠি সূর্যের আভায়, দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল কতোটুকু সময়ের জন্য ছেলের বিচ্ছেদবেদনা ভুলে আনন্দিত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

বাগান থেকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফিরে আসছিলেন ভিতর বাড়িতে, হঠাৎ গেটের কাছে মস্ত বাদাম গাছের তলায়, মালির ঘরের দাওয়ায় তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিছুদিন থেকে মালি দেশে
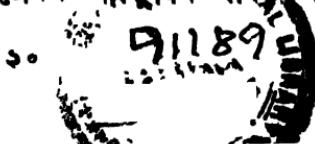
গিয়েছে। তার তালাবন্ধ ছোট্ট ঘরের টালি-ঢাকা বারান্দায় মনে হ'লো শুয়ে আছে কেউ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুর থেকেই নজর করলেন, তারপর এগিয়ে এলেন দ্রুতপায়ে। দেখলেন লাল পেড়ে হেঁটো খাপি শাড়ি পরা একটি মেয়ে হাতের ভাঁজে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে গুঁড়িসুড়ি মেরে। মুখটা শাড়ির আঁচলে ঢাকা। পরিষ্কার মনে আছে সোমেন চলে যাবার পরে ছোটু সিংকে তিনি আবার ফটকে তালা বন্ধ করতে দেখেছেন, ফটক বন্ধ করা বিষয়ে সে যথেষ্ট সাবধান, নইলে পাড়ার ছেলেদের জন্য এই বাগান রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এতো সকালে উঠে তো তার তালা খুলবার কথা নয়। এতো সকালে তার কোনোদিনই ঘুম ভাঙে না। তারও ভাঙে না, নিবারণেরও ভাঙে না, মালিরও না। তিনি নিজে ওঠেন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, মুখ হাত ধুয়ে লক্ষ্মীর আসনের সামনে পুজোয় বসেন, পুজো সেরে উঠতে উঠতে ওরা ওঠে। নিবারণ ঘর ঝাঁট দেয়, উনুনে আগুন ধরায়, ছোটু সিং ফটক খুলে নিমের ডাল ভেঙে দাঁতন করে, মালি ঝারি হাতে ঢুলতে ঢুলতে পুকুরের দিকে যায়।

এই তিনটি লোকই তাঁর শ্বশুরের আমলের। এ বাড়িতেই তারা বড়ো হয়েছে, এ বাড়িতেই বুড়ো হচ্ছে। এখন মহামায়া আর সোমেনকে ঘিরেই তাদের জীবন। অসময়ের দিনে এই তিনটি লোক নিয়ে মহামায়া যখন খেতে পরতে দিতে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, এরা অনুকূল বাতাসে আপন আপন পাল খাটিয়ে মহামায়ার চড়ায় ঠেকে যাওয়া নৌকোকে তীরে এনে তুলেছে। এরা তাঁর আপন জন, আপনের চেয়ে আপন, তাঁর পরিবারের অংশ। একটু দূরে, একটা মাঠ ছেড়ে মহামায়ার খুড়শ্বশুরের বাড়ি, অবস্থা তাঁর অনেক ভালো, ছেলেরা উপযুক্ত, ছেলের ছেলেরাও দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি রাখতে চেয়েছিলেন এদের, কিন্তু ওরা যায়নি। নিবারণের মমতার বস্তু সোমেন। তাকে সে আঁতুর ঘর থেকে কোলে কাঁখে ক'রে মানুষ করেছে. ছোট সিংয়ের মমতার বস্তু বৌমা, নিবারণেরও আগে সোমেনের

বাবাকে সে বিয়ে দিয়ে এনেছে; আর মালির আকর্ষণ বাগান।
সোমেনের দাদুর আমলে সে এই বাগান নিড়োবার কাজে লেগেছিলো।
এখন সবচেয়ে বৃদ্ধ সে-ই, কাজ করবার ক্ষমতা প্রায় অপহৃত হয়েছে
তার, কাসিতে ভুগছিলো, টাকাপয়সা দিয়ে সেরে আসবার জন্য
মহামায়া তাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন, মনে মনে জানেন এই যাওয়াই
তার শেষ যাওয়া, বেদনার সঙ্গে সেই বিদায়কে তিনি মেনে নিয়েছেন।

॥ ৩ ॥

একটু অবাক হ'য়ে মেয়েটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন
তিনি। একটু অপেক্ষা ক'রে ডাকলেন, 'এই, শুনছ?'

প্রথম দু'এক ডাকে যখন তার ঘুম ভাঙলো না, একটু গলা
চড়ালেন আর তৎক্ষণাৎ আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো মেয়েটি। কিন্তু
তার ভঙ্গি দেখে মনে হ'লো না কিছুমাত্র অপ্রস্তুত হয়েছে। যেন
এইটাই তার বাড়িঘর, যেন স্থানে স্থিতিতেই শুয়ে ঘুমুচ্ছিলো এই
রকম ভাবে পা ছড়িয়ে হাই তুললো। একটা অস্পষ্ট দৃষ্টি মেলে বেলার
দিকে তাকালো, তারপর মহামায়ার চোখে চোখ পড়তেই হঠাৎ গায়ে
মাথায় কাপড় টেনে ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো।

মহামায়া ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কে তুমি?'

মেয়েটি ঢোঁক গিলে জবাব দিলো, 'আমি—আমি কুসুম।'

কুসুম খুব বিখ্যাত ব্যক্তি বলে মনে পড়লো না মহামায়ার।

চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'এখানে কী করছিলে?'

'একটু শুয়েছিলাম।'

'শোবার কি তোমার অন্য কোনো জায়গা ছিলো না?'

কুসুম অধোবদনে চুপ।

'এটা অন্য একজনদের বাড়ি, এটা কি ঘুমুবার জায়গা?'

কুসুম চুপ।

'এদিকে ফটক তো বন্ধ, ঢুকলে কী ক'রে?'

কুসুম চুপ।

'কিছু বলছ না কেন ?'

'বড্ড কষ্ট ক'রে ঢুকিছি মা।'

'কষ্ট ক'রে ?'

'তোমার তার কাঁটা লেগে আমার সব্বাঙ্গ ছিঁড়ে গেছে।'

'তুমি তার কাঁটার ভিতর দিয়ে ঢুকেছ ?' অবাক হলেন মহামায়া। মহামায়ার বাড়ির চৌহদ্দি বড়ো কম জায়গা নিয়ে নয়। চারদিকে মেহেদির ঝোপ, ফাঁকে ফাঁকে ঘন বুনোটের তার কাঁটা। একটা কুকুরও ঢোকে না তা ভেদ ক'রে, তার মধ্যে একটা মানুষ! সর্বাঙ্গ যদি না ছেঁড়ে সেটাই তো আশ্চর্য।

তিনি বললেন, 'কিন্তু এভাবে এখানে ঢুকেছ কেন তুমি ?'

'লুকিয়েছিলুম।'

'লুকিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ গো মা, আমি পেইলে এসেছি কিনা!'

'পালিয়ে এসেছ!'

'হ্যাঁ মা।'

'কোথা থেকে পালিয়ে এসেছ ?'

'হুই ধুপছায়া গেরামে, সোইযে কৈবর্ত বাড়ি ?'

'কেন পালিয়ে এসেছ ?'

কুসুম মাথা নিচু ক'রে পা দিয়ে মাটি খুঁড়লো।

'অতদূর থেকে কে তোমাকে পালাতে বলেছে ?'

'কেউ বলেনি, আমি আমার আপনার দুস্কেই পেইলেছি। মাগো, আমি বড়ো বেপন্ন।'

কী আশ্চর্য! মেয়েটা শেষে তাঁকেই তার দুঃখের ত্রাণকর্ত্রী হিসেবে ঠিক ক'রে নিলো নাকি ? কী উৎপাত। মুখের দিকে ভালো ক'রে তাকালেন। একেবারে কচি একখানা নিষ্পাপ মুখ। গরীব ঘরের মেয়ে, কিন্তু ঈশ্বর তাকে রূপ দিতে কার্পণ্য করেননি। ফুটফুটে গায়ের রং, চাঁদের মতো কপাল, টানা টানা চোখের উপরে দুই টানা

ভুরু, টিকোলো নাক, নরম ঠোঁট, ভুট্টার দানার মতো ঠাসা সন্নিবিষ্ট দাঁত, লম্বাটে চিবুক, বাদামী ছাঁদের মুখের ডৌল, তাকিয়ে দেখবার মতো। টেনে খিঁচে মস্ত একটা খোঁপা বেঁধেছে। বয়েস বড়ো জোর আঠারো, যৌবনের অঢেল লাবণ্যে সরস। বড়ো বড়ো দুই নির্বোধ চোখ মেলে মহামায়ার মুখের দিকে করুণা ভিক্ষা ক'রে তাকিয়ে আছে।

মহামায়া চোখ সরিয়ে নিলেন। অন্যমনস্কভাবে একটা গাছের পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন, 'কখন ঢুকেছ এখানে?'

'সেই-ই কাক ভোরে, আত্তির যখন যাই যাই করছেলো, মুর্গি-গুলো যখন কেবল কক্কুরুতু কু বইলে ডেইকে ডেইকে উঠতিছিলো, তেখন।' তার মানে সোমেন যাবার সঙ্গে সঙ্গেই—মহামায়া ভাবলেন।

'আগে কোথায় ছিলে?'

'ধরো দৌড় মেরেছি আত নটায়, সেই একই দৌড়ে বাপের ঘর। সেই নেতাই, হলদি গাঁয়ের নেতাই দাস, সে আমার বাপ কিনা। পেরথমে তাই বাপের ঘরেই গেনু, ঝাঁপ খুইলে দিয়ে বাপের দ্বিতীয় বার বিয়ে করা ইস্তিরি, আমার সতালমা, বললো—'আবার তুই পেইলেছিস সোয়ামীর ঘর থেকে?' ঢুকে পড়ে বললুম—কেন পেইলেছি সেটা তো আগে শুনবে? কিন্তু শুনলে না, দুদ্দুর কইরে খেইদে দিলে। অন্ধকার আস্তায় বেরিয়ে একটু দেঁইড়ে থেকে ভয়ে ভয়ে আবার ছুটতে লাগলুম, খানিক দূরে একটা মাসাতো বুন থাকে, মনে হ'লো তার কাছে যাই। একটা আশ্ছয় তো চাই। গিয়ে দেখনু বুনটা ছেলে হ'তে বাপের ঘরে গেছে, ঘর খাঁ খাঁ আলগা। ভগ্নিপোতটা বসে বসে তামাক টানছেলো, ভগ্নিপোতের নব্বুই বছরের বুড়ো বাপটা কানা চক্ষু নিয়ে ফোকলা মাড়ি দিয়ে চোদ্দোপুরুষের মাথা খাচ্ছিলো। আমি উঠোনে পা ফেলতেই বাপ ব্যাটা 'কে' বলে হেমন জোর হেঁইকে উঠলে যে আমি এঁতকে উঠলাম। কুপি আর লাঠি নিয়ে এইগে এলো ভগ্নিপোতটা, শেষে আমাকে দেখে সাব্যস্ত হ'লো। দাঁত নিটকিয়ে বলে, 'কী গো, এতো আত্তিরে কী মনে করে?' তেখন

আমি মন খুইলে ছুক্কের কথা বললুম। আমার সোয়ামীর কথা কে না জানে। কে না জানে যে আমার শাউড়ি মঙ্গলীর তুল্যি কুচ্ছ নোক যাবতীয় সংসারে নাই। ঘরের কথা পরের কাছে বলতে কি কারো ভালো লাগে? কিন্তু না বলে যে পারছিলুম না, ছুক্কে ছুক্কে সকল কথা মুখ দে বেইরে আসতে লাগলো। কেবল একটা কথাই গোপন করনু। সে কথা বলা যায় না কাউকে। সব চুকুরে শুইনে নিয়ে এক গাল হেসে ড্যাকরা বলে কি—'তোমার সোয়ামীর মুয়ে আগুন, তোমার শাউড়ির কপালে আগুন, ঘর ছেড়েছ বেশ করেছ, এক আত কেন গো, যতো আত খুশি থাক না ক্যানে, তোমাকে আমি আমার পাটরাণী কইরে এইখে দেবো। তোমার বুনটা তোমার পায়ের যুগ্যি নয়, তার উপর ছেলে বিয়োতে বিয়োতে একেবারে একটা শুয়োরণী হইয়ে গেছে, বুইল্লে, ওটাকে নিয়ে আর আমার স্থখ হয় না। বলতে গেলে আতগুলি আমার বিথাই যায়। তুমি হবে আমার আতের সখি।'

'কথা শোনো মা। না হয় তোর শালিই হই, তাই বইলে এসব বদ অসিকতা করবি তুই? মুখ তো নয়, যেন নরক। আরে গন্ধপ, তুই কি এটাও বুঝিস না, হাজার হোক তোর বৌ তো আমার বুন? তাকে অমনি বললে আমার আগ হয় না, বেক্ত লাগে না? ঘেন্নাও হ'য়েছিলো খুব, কিন্তু কী করবো মা, কুথায় যাবো। আস্থির ক'রে এট্টা আশ্ছয় তো চাই? মেয়েছেলে তো? পথে কি ঘুরতে পারি? বন জঙ্গলে ভয় পাই না, ভয় আমার পুরুষের। ওগুলো যে সাপ বাঘের চেয়েও বিষম। ভাবনু একটা আত পড়ে থাকি কোনোমতে, যখন সূয্যদেব দয়া ক'রে উঠবেন, তেক্ষুনি যেদিকে দু' চোখ যায় ছুটবো। ঠাঁই পাবোই একটা। চাঁটাই পেতে চুপটি ক'রে পড়ে রইনু। অত ছুটিছি, এট্টা কেলান্তি তো হয়েছে। চোখে এসে অমনি নিদ্রাদেবী ভর করেছেন। তা করলে কী হবে, মনের মধ্যে তো ধুকপুকানি ছেলো, ঠিক টের পেইয়ে গেনুম। আত নিশুতি হালে, বুড়ো হাব্‌রাটা কাসতে কাসতে ঘুইমে পড়লে, সেই হাড়হাবাতে কুচুক্কুরে কুত্তাটা কখন এসে

হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গায়ে। মেয়েছেলে হ'য়ে কী পাপ করেছি গো মা। পাখী নই যে উড়ে যাবো, এই ড্যানা ত্ব'টোয় আর কত শক্তি বলো? ঠেলে কি ফেলতে পারি? আঁচড়ে কামড়ে হারামজাদাটাকে ছিঁড়ে দিনু অন্ধকারে, তবু সরাতে পারি না। ত্বষমনটার গায়ে তখন পাহাড়ের জোর নেমেছে, যেন বাঘে অক্তের গন্ধ পেইয়েছে, কী ক'রে যে অক্ষা পেয়ে ঝাঁপ খুইলে বাইরে এসে ছুট দিনু জানিনে মা। ছুটতে ছুটতে যে কোথায় এসে থামলুম তা-ও জানি না। আর পারছিলুম না, পড়ে রইলুম সেখানেই। তাপর যেখন আকাশে অং ধরলো, ভাতের ফ্যানের মতো ভোরের গন্ধ দিলো, সূয্যিদেব বস্ত্র বদলাবেন মনে হ'লো, তেখন মনে বড়ো ভয় হ'লো। ভাবনু, কী জানি কেউ যদি ধ'রে ফেলে, কেউ যদি দেখে ফেলে, যদি পিছনে পিছনে ওরা ছুটে এসে থাকে কেউ, যেই মনে হওয়া অমনি দিগ্বিদিকহারা হ'য়ে তোমার ঝোপ দিয়েই ছিঁড়ে খুঁড়ে ঢুকে পড়লুম এখানে। চুপে চুপে এই দাওয়াটায় এসে পড়ে রইলুম। মাগো, আমাকে আশ্ছয় দাও তুমি, মাগো, আমাকে তুমি অক্ষা করো, এই আমি তোমার চরণ ধরলুম, মারো কাটো যা খুশি করো।'

বুক দিয়ে পড়ে মহামায়ার ত্বই পা জাপটে ধরলো কুসুম। মহামায়া ব্যস্ত হ'য়ে স'রে দাঁড়ালেন, বুঝতে পারলেন না কেন এই মেয়ে এমন ক'রে প্রাণের ভয়ে খরগোসের মতো দৌড়ে পালিয়ে এসেছে। মেয়েটার কপাল-ভরা সিঁত্বর লেপটে আছে, হাতে মোটা শাঁখা।

কতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে পারলেন না মহামায়া। ততক্ষণে ভোরের আলো সাদা হয়ে ছড়িয়ে গেছে সারা বাগানে, পূব আকাশ ফেটে বেরিয়ে আসছে রং। মাথার কাপড়টা খসে গিয়েছিলো, তুলে দিলেন ধীর হাতে, ভারি গলায় বললেন, 'তোমার স্বামী আছে?'

'নেই!' তুলি-আঁকা ভুরু ত্ব'টো উপরের দিকে উঠালো কুসুম, 'যদি না-ই থাকবে তবে আমাকে কে এমন ক'রে সাজা দেবে।' সে অকাতরে পিঠের কাপড় তুললো, বুকের কাপড় লজ্জা থেকে যতোটা পারলো সরিয়ে দেখালো।

'এ কী!' আঁৎকে উঠলেন মহামায়া। 'মেরেছে? এমন ক'রে মেরেছে?' শিশুর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কুসুম, শিশুর সরলতা নিয়ে তাকালো মহামায়ার মুখের দিকে।

'আহা রে', বেদনায় গলে গেলেন তিনি। 'এ যে দগদগে ঘা হয়ে গেছে।'

'তবে?' সহানুভূতি পেয়ে কুসুমের দুই চোখে জলের ধারা নামলো। 'তা-ও তো তোমাকে চুলের গোড়া দেখাতে পারলুম না। রেগে গেলে মুঠি ধ'রে উপড়ে উপড়ে আনে গো মা। গরমকালে ফুলে ফুলে পেইকে ওঠে।'

শুধু কুসুমেরই নয়, জল মহামায়ার চোখেও এলো। কেঁদে বললেন, 'কী করো তুমি? কী দোষ করো যে এমন ক'রে মারে?'

'শাশুড়ি যে নাগায়, কান ফুসকুড়ি দেয়। বলে, তর বৌ বারো ভাতারি।'

'আর স্বামী অমনিই মারে?'

'মারবে না? আমি যে ওর ইস্তিরি, ওর অধিক্কিত সামগ্গিরি। আমাকে মারবে না তো কাকে মারবে? খিদে পেলে মারবে। আল্লা খারাপ হ'লে মারবে। শইল যদি এমন তেমন হয় আর কাজ না করতে পারি তবে মারবে—'

'কী ভয়ানক!'

'মাগো, সে মানুষ না, সে বনের জন্তু।'

'তা হ'লে এখন তুমি কী করবে?'

'আমি আর ফিরে যাবো না, আমি পেইলে থাকবো।'

'কোথায় পালিয়ে থাকবে?'

'তুমি আমাকে রেখে দাও।'

'আমি কেমন ক'রে রাখবো, বলো? ওরা যখন খোঁজ পাবে—'

'পাবে না, পাবে না। তুমি কাউকে বলে দিও না।'

মহামায়া চুপ ক'রে রইলেন।

'শুধু কি সোয়ামীই মারে গো মা, শাউড়িটা মারে না?' গলা

কাঁপলো কুসুমের। 'ঐ যে ঘা দেখলে, ও তো আমার পোড়ার ঘা।'

'পুড়িয়ে দিয়েছে। শাশুড়ি?'

'কুসুম কি কখনো মিছে কথা বলেছে? সে তুমি গাঁয়ের সব্বাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পার।'

'কেন? কী করেছিলে তুমি?'

'আমি আমার সোয়ামীর তাড়ির পাত্তরটা পুকুরঘাটে ফেইলে দিয়েছিলুম। স্বীকার করি, নিশার জিনিস ফেইলে দিলে সকলেরি রাগ হয়। কিন্তু কেন ফেইলেছিলুম তাতো তুমি শুনবে? সে কথা শুনলে কিছুতেই তুমি আমাকে অন্যায্য কথা বলবে না।'

'তাড়ি খেয়েই রোজ মারে বুঝি?'

'মারুক, একশোবার মারুক, সে তো আমাদের ঘরে ঘরেই মারে। পুরুষের আগ তো? বৌকে মারবে তার আর কী? কেন্দে কেটে না খেয়ে ঘরেই তো পড়ে থাকি, আর কি কোনোদিন পা তুলেছি ঘরের বাইরে? কিন্তু আজ যে পারলাম না। কেন পারলাম না বলো? আমি তো মেয়েমানুষ, আমার একটা ইয়ে আছে না? সোয়ামীটা বড়ো মন্দ, বড়ো অসৎ। খালি বলে তুই সোন্দোর, তুই খারাপ, তোর দিকে সব পুরুষের নজর। তুই অসতী। তোকে আমি বেচে খাবো। আচ্ছা বল তো মা, এ কি এট্টা কথা। নিশা করে তো। টাকা টাকা কইরে যেন উন্মাদ। এমন মানুষ কী বলবো ক'দিন থেকেই দেখছি এট্টা কোঁকড়াচুলো বদপেনা দেখতে নোকের সঙ্গে কেবল হলাহলি ঢলাঢলি। সেটা নিত্যি আসে আর আমার সোয়ামীকে শাউড়িকে কী যেন জপায়। যদি আমাকে দেখে কেমন যে মটকে মটকে তাকায়, গা আমার শিউরে শিউরে ওঠে। কাল দেখি কি, মায়ে পোয়ে মিলে কী যেন শলা করছে। সকাল থেকে ঐ নোকটা সারাদিন থাকলো, কতো বাজার কইরে নিয়েলো, দফায় দফায় মাছ মাংস খেলো, শেষে দেখলুম আমার শাউড়ির হাতে আর সোয়ামীর হাতে নীল নীল নোট গুঁজে দিচ্ছে। যখন সাঁজ নামলো, সুয্যিদেব পাটে গেলেন, পাড়ার জ্ঞাতগুষ্টিরা যার যার ঘরে ঝাঁপ এঁটে

আত্তিরের খাওয়া খেয়ে কুপি নিবিয়ে দিলো তখন থলি থেকে 'বোতল বোতল কী বার করে দু'জনে মিশে খুব খেলে। আমি বাতার ফুটোয় অঙ্গঅস দেখতিছি কেবল, আবার এট্টু এট্টু ভয়ও করছে। খানিক পরে সোয়ামী এসে বলে কি 'ওঠ, ওঠ, আমার বন্ধু তোরে অ'দর করি ডাকতিছে।' এই শুনে আমি এগে গেলুম। আগবো না বলো? বলনু, 'তোমার বন্ধুর মুয়ে আগুন।'

মারমূর্তি হইয়ে চোখ বার ক'রে বলে, 'কী বললি?'

তখন আমি আগ সামলে বুঝিয়ে বলনু, 'এটা তুমি কী বলতিছ? তোমার কি মাথা গরম হইয়েছে? গেরস্ত বৌ কখনো পরপুরুষের আদর খায়?'

'হ্যাঁ, খায়। তোর মতো মেয়েছেলের জন্যই তো পরপুরুষের আদর, ওঠ।'

'ছি ছি ছি, আমি ঘরের বৌ না, তোমার বিয়ে করা ইস্তিরি না, আমি কেন এই আত ক'রে ঐ লোকটার কাছে যাবো?'

'দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি' এই বলেই এক ঘা মাইরলে। মানুষটা তখন বেহুঁশ, দাঁড়াতে পারছে না, পা টইলে যাচ্ছে, কোমরেব গোঁজা থেকে লোট দেখিয়ে বলে, 'দেখ, কতো বড়োলোক, তোকে নিয়ে আজ আতে একটু ফুর্তি করবে বলে কতো দিয়েছে, এমনি রোজ দেবে, তুই টু শব্দটি কইরতে পাবি না। যেন কাক পাখিটিও না জাইনতে পারে। যদি টালবাহানা করিস, গাছের ডালে ফাঁসি লইটকে দেবো। ভালো চাইস তো আয়, আয় শীগ্‌গির।' আমি জিব কাটলুম, বিছানা ধ'রে আঁকড়ে পড়ে রইলুম, ভয়ে ঠক ঠক কইরে কাঁপতে লাগলুম। তখন বন্ধুটা এসে ঘরে ঢুকলো। কী সাজ! কী টেরি! টপ কইরে হাসতে হাসতে আমার বিছানায় আমার গা ঠেসে বসে বলে, 'আজ তো তুই আমার সঙ্গেই শুবি, রোজ শুবি, তোকে লিয়ে শোবো বলেই তো এনু।' বলেই আমায় জাপটে ধ'রে চুমু খেলে। আমার কি তখন আর জ্ঞানগম্যি অইল? শইরে যেন মত্ত হাত্তির বল নিয়ে একটা নাথি মেরে ওটাকে ফেইলে দিনু। তাপর ছুইটে

গিয়ে তাড়ির হাঁড়ি, নিশার বোতল সব পুকুরে ডুইবে দিনু। ডুইবে দিয়েই পেইলে আসবো ঠিক কইরেছিলুম, মনে মনে ভেইবে নছিলুম, না, আর না, আর যেখানেই যাই এখানে আর না। যে সোয়ামী বৌ দিয়ে টাকা চায়, সে আবার সোয়ামী! তার ঘরে এক আতও আর না। দেখি শাউড়িটা এসে পথ আগলে দেঁইড়েছে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'মাগী আবার সীতা সাবিত্তি সেইজেছে। তোর চরিত্তিরের কথা জানতে যেন আর বাকী আছে কারো। পথে যখন বেরোস দশটা ব্যাটা পিছু লয় না তর?' আচ্ছা বল তো মা, ব্যাটারা যদি পিছু লয়, সে কি আমার দোষ? আমি কি চোখ তুইলে তাকাই? না ঘোমটা দিই না। আর শাউরি, সোয়ামীর মা, সে তো আমারো মাতৃতি জাতি, ছেলের বৌও যা আপন মেয়েও তা, সেই কিনা আমাকে এসব বুলছে? ঘেন্নায় যা মুখে এলো বলে দিলুম, এগে বললুম, 'কেন, আমি কি বাজারের বেবুশ্যে? এই সব তুমি আমাকে কী বুলছো গো?'

'বলছি, ভালো চাস তো ঘরে যা, চুপ ক'রে শো গিয়ে।'

'তোমার সখ থাকে তো তুমি শোও গিয়ে, আমি চললুম।'

বলতেই শাউড়িটা ছুইটে এসে মুখ চেইপে ধরলো, নাথি মেরে মাটিতে ফেইলে দিয়ে বললো, 'যতো বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা, তোকে আজ শেষ করবো।' এই বলে একটা গণগণে কয়লা এনে চিমটে দিয়ে ঠেসে ধরলো পিঠে, আর সইতে না পেরেই না আমি ক্ষেপে গিয়ে—' জিব কেটে থামলো কুসুম।

মহামায়া স্তব্ধ ভঙ্গিতে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন।

॥ ৪ ॥

ততোক্ষণে সূর্যের সোনার আলো ছড়িয়ে পড়লো দিক্‌বিদিকে। রোদের নরম তাপ আরাম দিলো পিঠে, বিছানার আলস্য ছেড়ে উঠে পড়লো সব, সংসার সচল হ'লো। সবচেয়ে প্রথম দুধের বালতি হাতে দীনুগোয়ালাকে দেখা গেল সরু রাস্তার মধ্যে। তারপর রেজাউল

করিমের ছোট ছেলেটা ঘুন্টি টুনটুন করতে করতে ছাগল নিয়ে চলে গেল, মণ্ডলরা বেরুলো লাঙ্গল নিয়ে, রাধু দাসী সারা গায়ে কাপড় মুড়ে নাক ঢেকে ঠিকে কাজে বেরুলো, ডিমওয়ালি বেরুলো ডিম নিয়ে, শাকওয়ালি শাক নিয়ে—সংসারের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করলো। মহামায়া তাকিয়ে থেকে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন, বললেন, 'এসো, আমার সঙ্গে।'

ভীরু ভীরু চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মহামায়াকে অনুসরণ করলো কুসুম। অন্দর বাড়ির অংশটুকু দেয়াল ঘেরানো, দরজা দিয়ে ভিতরের উঠোনে এসে সে একটু দাঁড়ালো, বড়ো বড়ো চোখে অবাক হ'য়ে বাড়িটা দেখতে লাগলো। মনে মনে ভাবলো এটা কোনো রাজার বাড়ি না তো? ইনি বোধহয় একজন রাণি-মা? কোনো দালান-কোঠাওলা ভালো বাড়ি সে কোনোদিন দেখেনি। তাদের ঘরে সব ঘর আর ঘর। তুষের চাল, মাটির বেড়া। বড়োলোকদের টিনের চাল দরমার বেড়া। কায়েতপাড়ায় পাশ-বাড়ি আছে বটে দু'একখানা, তার ভিতরে কুসুম ঢোকেনি কোনোদিন। সুতরাং তার চোখে এ বাড়িটি রাজবাড়ি ছাড়া আর কিছু মনে হ'লো না।

বাড়িটি মহামায়ার শ্বশুরের আমলের। নিজের পুরোনো পৈতৃক বাড়ীতে খুড়শ্বশুর আছেন। তাঁর শ্বশুর সেখান থেকে আলাদা হ'য়ে নিজেই এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের সময়ে তিনি পছন্দ ক'রে নারকেল সুপুরির ঘেরা এই আম-কাঁঠালের বাগানটি নিয়ে বিনিময়ে বাড়ির সত্ত্ব লিখে দিয়েছিলেন ছোটো ভাইকে। সকলে তাঁকে বোকা বলেছিলো। অট্টালিকা ফেলে অরণ্য! বোকা বলবে না তো কী? বিষয়বুদ্ধিতে খুড়শ্বশুর তাঁর শ্বশুরের চাইতে অনেক বেশী পাকা ছিলেন। এক কথায় বাগানের অংশ লিখে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

একটি মাত্র ছেলে আর স্ত্রী নিয়ে প্রথমে শ্বশুর একখানা টালির

বাংলো বাড়ি তৈরী ক'রে উঠে এলেন এখানে। বাগ-বাগিচা জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো, কিন্তু এই বাগানটি তখনো সযত্নে রক্ষিত হ'তো। সেই সময়ে ফুল বিক্রীর ব্যবসা ছিল তাঁদের। সার কিনে মালি খাটিয়ে যতো খরচ ক'রে ফুল ফোটানো হ'তো, শেষের দিকে আয় তো দূরের কথা তার আদ্ধেক খরচও ফুল থেকে উঠে আসতো না সংসারে। সকলেরই চক্ষুশূল হ'য়ে উঠেছিলো এই বাগানটি। কিন্তু শ্বশুর রাজেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী লেগে থাকতেন বাগানের পিছনে।

এখানকারই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় মাষ্টার ছিলেন তিনি. সাত্ত্বিক জীবন ছিলো, লোভ ছিলো না, মোহ ছিলো না, শুধু সখ ছিলো এই বাগানের। তিনি অংকের মানুষ ছিলেন। এক সময়ে একটি পাটিগণিত লিখে নাম করেছিলেন প্রচুর। কিন্তু আয় করতে পারেননি কিছু। নিজের টাকা ছিলো না, বন্ধুর নাম নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত ক'রে নিয়ে তাঁর সাহায্যেই বার করেছিলেন বইটি। শেষ পর্যন্ত বন্ধু ঠকালো। একটি পয়সা দিলো না, অথচ একটা সময়ে হাজার হাজার কপি বিক্রী হয়েছিলো সে বই। না, তা নিয়ে কখনো দুঃখ করেননি তিনি। তাঁর টাকার জন্য শোক হয়নি কোনোদিন, হয়েছিলো বন্ধু-শোক! বন্ধুকে ভালোবাসতেন, তার অধঃপতনটাই তাঁকে মর্মাহত করেছিলো। তার বিচ্ছেদটাই তাঁকে আহত করেছিলো।

পরিবার বড়ো ছিলো না, খরচের বাহুল্য ছিলো না, পৈতৃক বিত্ত হিসাবে তামা কাসা পিতলের অধিকারের বদলেও তিনি ভাইয়ের কাছ থেকে সামান্য নগদ টাকা ধ'রে নিলেন, বাজারের মধ্যে একটি বড়ো মনোহারী দোকান ছিলো, সে অধিকারও এভাবেই ছেড়ে দিলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে সেই নগদ টাকা দিয়ে নিজের মনোমত ভঙ্গিতে এই বাড়িটি তুললেন। বড়ো বড়ো ঘর, বড়ো বড়ো জানালা, আর দামী সিমেণ্টের মেঝে। দোতলায় তিনখানা ঘর, একতলায় তিনখানা ঘর। দোতলায় জাফরিকাটা রেলিংওলা বারান্দায় কাচ-ঢাকা জানালা, খুলে দিলে সারা আকাশ এসে ঘরে লুটোয়।

॥ ৫ ॥

সেই জাফরিকাটা রেলিংওলা বারান্দায় তাকিয়ে কুসুম অবাক হ'য়ে গেল, স্বর্গের মতো সুন্দর লাগলো তার। আধো কৌতূহল আর আধো ত্রাস নিয়ে মনোযোগী দৃষ্টি ফেলে সে দেখতে লাগলো সব। কুয়োতলা দেখলো, ডালপালা ছড়ানো বেঁটে পেয়ারা গাছটা দেখলো, দালানসংলগ্ন টানা রান্নাঘর দেখলো, রান্নাঘরের বাঁধানো উনুন দেখলো, সবই তার কাছে বিস্ময়ের বস্তু বলে মনে হ'তে লাগলো।

কিন্তু লোকজন কই? কেউ কি থাকে না? মনে মনে ভাবলো কুসুম। এমন নির্জন-নির্জন ভাব কেন? তবে কি ইনি একাই থাকেন? তা হ'লে কিন্তু বড়োই ভালো হয়। আবার কে কেমন হবে কে জানে। ইনি ভালো, খুব ভালো, খুব সুন্দর, মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ফেরে না। অবশ্যি একটু একটু ভয়ও করছে। কিন্তু কী নরম কথা। মা। হ্যাঁ, ঠিক মা। যে রকম মা মনে মনে কতোদিন কল্পনা করেছে কুসুম, ঠিক সেই মা। মা ডাকতেই মন ভালো হ'য়ে গেল। একটুও বকলেন না তাকে। আদর ক'রে ঘরে নিয়ে এলেন। আশ্রয় দিলেন। এই দুঃখের কথা তো তার বাপও শুনেছিলো, কই, সে তো থাকতে দিলো না তাকে। কিন্তু—কিন্তু কুসুমের চোখে ভয়ের ছায়া পড়লো, কেন নিয়ে এলেন? কী করবেন? ধ'রে রেখে খবর পাঠিয়ে দেবেন ওদের কাছে? হঠাৎ রঙ্গেশ্বরী দিদির কথা মনে পড়ে গেল। সারা সংসারে ঐ একটা মানুষ, যে তাকে একটু মিষ্টি কথা বলতো, বোনের মতো আদর করতো, চুল বেঁধে দিতো কালা কালা বেণী ক'রে। স্বামী যখন তাকে মারতো, টেনে নিয়ে যেতো, রেগে গিয়ে বকতো দেওরকে। বলতো 'হ্যাঁগা যুধিষ্ঠির ঠাকুরপো, তোমার কি হিদয় বলে কিছু নেই। এমন সুন্দর এমন ঠাণ্ডা মেয়েটাকে এই রকম ক'রে পিটতে তোমার পাণে লয়?' যুধিষ্ঠির মুখ ভেংচে দিতো তাকে, 'যাও যাও, পরের হ'য়ে আর সাউখিরি কইরতে হবে না। আমি তোমার দোজবর তারু কৈবত্ত নই যে বউয়ের

পা-চাটা হ'য়ে পড়ে থাকবো। আমি পুরুষ, মরদের ব্যাটা মরদ, বৌকে পিটিয়ে সিধে না করলে যে তোমার মতো মাথায় চড়বে।'

তা ঠিক। রঙ্গেশ্বরী দিদির স্বামী দোজবরই ছিলো। তাতে কী। কী ভালো ছিলো। রঙ্গেশ্বরী দিদিকে কোনোদিন মারতো না। আর ঐ জন্মেই কাতুবালা দেখতে পারতো না বৌকে। বলতো, আমার ছেলেকে তুই তুক্ করেছিস। রঙ্গেশ্বরী যখন বিধবা হ'লো, ছেলের জন্য কাঁদবে কী, এবার যে বিধবা বৌকে ইচ্ছে মতো মারধোর করতে পারবে, সেই সুখেই ছেলের শোক ভুলে গেল সে। আহাহা, কীভাবে মারা গেল তারু ভাসুর। ধান খেতের আল বেয়ে গান গেয়ে গেয়ে আসছিলো—সাপের মাথায় পা পড়ে গেল, সাপ কি তখন ছাড়ে? তখুনি দংশন ক'রে নীল বিষ ঢেলে দিলো। আছড়ে পড়ে কী কাঁদন কাঁদলো রঙ্গেশ্বরী দিদি। তিনমাস পেট তখন। তারপর এই তো চারমাস কেটেছে, এর মধ্যেই মেরে ফেললো মানুষটাকে।

কুসুম জানে, সব জানে। খবর কিছুই চাপা নেই। রঙ্গেশ্বরী দিদির সতীনের সাত বছরের ছেলেটা সব দেখেছে। তার ঠাকুমা যে হাতের জাঁতি ছুড়ে মেরেছে, তা সে উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখেছে। চুপে চুপে ঠাকুমাকে লুকিয়ে ছেলেটা বন্ধুর কাছে দুষ্টুমি করতে গিয়েছিলো। ভেবেছিলো যেমন লুকিয়ে গেছে, তেমনি লুকিয়েই সুরুৎ ক'রে ঢুকে পড়বে ঘরে। মাকে ভয় পেতো না সে, সৎমা হ'লেও রঙ্গেশ্বরী নিজের ছেলের মতো যত্ন করতো! সে-ও মাকে ভালোবাসতো। ভয় পেতো ঠাকুমাকে। বাঘের চেয়ে, যমের চেয়ে বেশী ভয় পেতো। ছোটো বোন দু'টোকে কোলে কাঁখে নিতো সে, ঠাকুমা যখন মাকে কষ্ট দিতো, কষ্ট পেতো।

সে দেখেছে। উঠোনের কোণে দাঁড়িয়ে সে যখন ঠাকুমার চক্ষে ধুলো দিয়ে ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করছিলো সেই সময়েই এই ব্যাপার।

সব কথা সে তারপর চুপে চুপে এসে কুসুম কাকিকে বলে দিয়েছিলো। ভাবতে প্রাণটা আঁৎকে উঠলো কুসুমের। ছেলেটা বলেছিলো রঙ্গেশ্বরী দিদির কপাল কেটে গিয়ে রক্ত ছুটছিলো, সেই রকম রক্ত তো সে তার শাশুড়ির কপাল কেটে দিয়েও ছুটিয়ে দিয়ে এসেছে। তবে কি সে-ও —না, না, হ'তে পারে না, কক্ষনো না। ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠলো কুসুম। দাঁতে দাঁত লেগে এলো। হ'তে পারে না। পারে না। কিন্তু হ'তেও তো পারে? কুসুম তো জানে না কিছু। কুসুম তো তার পরে আর তাকায়নি। শুধু রক্তে ভেসে যেতে দেখেছে মুখটা, পড়ে যেতে দেখেছে মাটিতে। সহ্যশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো সে, পোড়ার যন্ত্রণায় সে দিক্‌বিদিকহারা হ'য়ে গিয়েছিলো, তার হাত ছাড়াবার জন্যই সে সমুখে যা পেয়েছিলো ছুঁড়ে মেরেছিলো, তারপর পালিয়েছিলো। কিন্তু মেরে ফেলেছে বলে পালায়নি, ওদের হাত থেকে নিস্তার পেতে পালিয়েছিলো। যদি জানতো মরে গেছে, দাঁড়িয়ে থাকতো। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে থাকতো। পুলিশের আশায় দাঁড়িয়ে থাকতো, বুক ফুলিয়ে বলতো, হ্যাঁ আমি মেরেছি. ফাঁসি দাও আমাকে। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। তার বদলে আমি—সব সইতে পারবো। কিন্তু তখন তো মনে হয়নি একথাটা। বিদ্যুতের মতো এইমাত্রই তা চমকে উঠেছে চিন্তায়।

॥ ৬ ॥

হেমন্তের ঠাণ্ডা, হুহু ক'রে একটা হাওয়ার ঝাপটা এলো উত্তর দিক থেকে। ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলো, মহামায়া ধীরে ধীরে থামওয়ালা বারান্দায় এসে থামলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বয়েস কতো?' প্রশ্ন শুনে খামোকা আঁৎকে উঠলো কুসুম, কেন জানি বুকের ভিতরটা গুরগুর ক'রে উঠলো, মহামায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থতমতো খেয়ে বললো, 'বয়েস? সে তো জানিনে মা।'

'নিজের বয়েস জানো না?'

'এ্যাঁ, হ্যাঁ জানি।'

'তা হ'লে জানিনে বলছ কেন।'

'আমি মিছে বলিনি।'

স্নেহার্দ্র চোখে তাকিয়ে মহামায়া হাসলেন, 'মিছে কথা কেন বলবে?'

'আমি বলছিলাম কি', কুসুম জিব দিয়ে ঠোঁঠ চাটলো, 'হুই যে বছর আমার বড়ো খুড়ার এস্তেকাল হ'লো, মাঘের শেষে বিষ্টি নেইমে খুব ভালো ধান হ'লো, আমার বেদবা খুড়িকে খেইদে দিয়ে আমার বাপ ভেন্ন হ'য়ে আরো দু'টো বলদ কিনে নে এলো—'

'সেই বছর তুমি জন্মেছ, না?'

'ঠিক। ঠিক গো মা, একেকেলে ঠিক।'

'আর বিয়ে হ'লো কোন বছর?'

'হুই যে বছর বড়ো পিসির বড়ো মেইয়েটাকে তার সোয়ামী পইত্যাগ ক'রে আবার একটা বে করলো, বড়োপিসে সপ্নাদ্য মাদুলি পেলো, আমার ছোট ভাইটা জন্মেই মরে গেল, মা'র সুতিকে হ'লো—'

'সেই বছর তোমার বিয়ে হ'লো, কেমন?'

'ঠিক মা ঠিক। তুমি না বলতেই সব বুইঝে ফেলো। ঐ বড়ো পিসেই আমার সম্বন্ধ ঠিক করেছেলো। বরের অনেক বয়েস ছিলো গো, অনেক দিন বিয়ে কইরবে না কইরবে না ক'রে শেষে আমাকে পছন্দ করলো। সবাই জানতো পাত্তর ভালো না, পাত্তরের মা বিষম আগী, তা আর কী হবে? আমার বাপের যে ধার ছেলো, টাকা পেলে আর বে দিলে। তা কী হবে, সবই অদেষ্ট।'

'খিদে পেয়েছে?'

কুসুম চোখ নত করলো।

'সারারাত ছুটে ছুটে খুব কষ্ট হয়েছে?'

কুসুমের চোখ আরো নত।

'পিঠেও নিশ্চয়ই খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?'

এবার কুসুমের চোখ ছলছলে হ'লো।

'তা হ'লে যাও, পুকুরঘাটে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এসে, কাপড় ছেড়ে নিয়ে খাবে, তারপর আমি তোমার পোড়া জায়গাটাতে ওষুধ লাগিয়ে দেবো।'

'কিন্তু আমার যে আর কাপড় নেই মা।'

'আমি দেবো।'

আহ্লাদে ঝলসে উঠলো কুসুম। কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে আরো একবার পা ছুঁতে গিয়েছিলো, মহামায়া দিলেন না বলে মেঝের ধুলো চাটলো।

মহামায়ার সবই থান কাপড়. কী দেবেন কুসুমকে? খুঁজে-পেতে সোমেনের একটা নকসি-পাড় ধুতি বার ক'রে দিলেন। এমনিতে আছে খালি গায়ে, কিন্তু মহামায়ার চোখে সেটা সহনীয় নয়, নিজের একটা ঢলঢলে ব্লাউসও দিলেন সঙ্গে, পুরোনো পেটি-কোটও দিলেন একটা। কুসুম একসঙ্গে এতো জিনিস পেয়ে খুব খুশি হ'লো। ব্লাউস তারও আছে, তার বাপ দিয়েছিলো বিয়ের সময়। একটা নয়, দু'টো। গোলাপী পেটিকোটও আছে একটা। শাশুড়ি পরতে দেয় না বিবি হয়ে যাবে বলে। অমনি শাড়ি পরতে কুসুমের লজ্জা করে, তাই পুরোনো কাপড় দিয়ে নিজের হাতে একটা পেটিকোট সেলাই ক'রে নিয়েছে। এখন সেটা শতচ্ছিন্ন। তার লাল রংয়ের গোলাপ ফুল আঁকা টিনের স্যুটকেসে আরো অনেক সৌখীন জিনিস আছে বিয়ের সময়কার। গন্ধ তেল, পমেটম, মাথার প্রজাপতি ক্লীপ, ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের একটা শাড়ি, কিন্তু কিছুই কাজে লাগে না তার। শাশুড়ি চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তা দিক, খাওয়া পরায় আর সাধ নেই কুসুমের। সত্যিই কোনো সখ নেই, বেঁচে থাকতেও ইচ্ছা করে না তার।

আজকে এই বাড়ির এই মায়ের ব্যবহারে, তাঁর হাত থেকে ধোপ-

দুরন্ত পরিষ্কার জিনিসগুলো নিতে নিতে হঠাৎ যেন কেমন কান্না পেয়ে গেল, সব কিছুই অন্য রকম লাগলো। ছেলেবেলাকার দু'একটা টুকরো-টাকরা সুখস্মৃতি উথলে উঠলো বুকের মধ্যে। এই রকম গঞ্জ সহরেই তার মামাবাড়ি ছিলো, ট্রেণে চড়ে একবার গিয়েছিলো সেখানে মায়ের সঙ্গে, ধূ ধূ মনে পড়ে, কেননা বড়ো হ'তে আর যায়নি। তার নিজের বাপের ঘরের চেয়ে, স্বামীর ঘরের চেয়ে মামাদের ঘর অন্যরকম ছিলো, মামারা সব কল-কারখানায় কাজ করতো, মামীরা সাজতো গুজতো, হাসতো, সিনেমা দেখতো, তাদের দেখে অবাক লাগতো কুসুমের। ভালো লাগতো। মামীরা তাকেও সাজিয়ে দিতো আদর করে, চোখে কাজল পরিয়ে দিতো, কপালে খয়েরের টিপ দিয়ে দিতো। মাকে বলতো, ঠাকুরঝি, তোমার মেয়েকে তোমাদের ঘরে মানায় না। শেষে একদিন শুনলো তারা বড়োলোক হ'য়ে কোলকাতা চলে গেছে। কুসুমের মা যখন মারা গেলেন, বড়োমামা এসেছিলেন। সুন্দর দেখতে, পরনের ধুতি পরিষ্কার, গায়ে লম্বা পিরন। ন' বছরের কুসুমকে তিনি আদর করেছিলেন, নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, বাপ দিলেন না। কেমন ক'রে দেবেন, ঘর দেখবে কে? বাপকে রান্নাবান্না ক'রে দেবে কে? আর মেয়ে গেলে খালি ঘরে থাকবেনই বা কী নিয়ে? তাছাড়া মামাদের পছন্দও করতেন না তার বাপ, মামাদের নাকি জাত গেছে, মামীদের সঙ্গে মিশলে স্বভাব খারাপ হ'য়ে যাবে। মনে আছে, মা যখন বাপের বাড়ি যাবার জন্য কাঁদতো, বাবা দিতেন না, ধমকাতেন, আর এই সব বলতেন। যদি সেই সময় মামার সঙ্গে যেতে পারতো কুসুম! এ সব কথা কবে ভুলে গিয়েছিলো, কিন্তু আজ সব মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে কেমন কষ্ট হ'লো।

॥ ৭ ॥

তির্যক দৃষ্টিতে কুসুমকে দেখছিলো নিবারণ। সরে যেতেই ভুরু কুঁচকে বললো, 'বৌমা, এ আবার কাকে জোটালে, বলো দেখি? তোমার পুষ্যির যন্ত্রণায় তো আর পারা যায় না।'

ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে হাসলেন মহামায়া। বললেন, 'মেয়েটা বড়ো সুন্দর, না নিবারণ?'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু এলো কোথা থেকে, আর কখনই বা এলো?'

'কী কষ্ট পেয়ে যে এসেছে!'

'এতো খবরই বা জানলে কখন, চেনো নাকি?'

'না, না, চিনবো কোথা থেকে। মালির দাওয়ায় পড়েছিলো, তাই—'

'দেখে দুঃখ হ'লো, বুঝেছি', বুড়ো মুখে স্নেহের লাবণ্য ছড়িয়ে হাসলো নিবারণ, 'তা সকলের দুঃখের বোঝা তো তুমি বইতে পারবে না বৌমা? আবার ঠকবে।'

মহামায়া মাথা নেড়ে বললেন, 'এই মেয়েটা দেখো খুব ভালো হবে।'

'ভালো হলেই ভালো, শেষে যেন আবার আপসোস করতে না হয়।'

'না, না।'

'হারুর কথাটা একটু মনে রেখো।'

'কিছুই ভুলিনি।' মহামায়া হাসলেন, 'তা তুমি আমাকে যতোই বকো নিবারণ, একে আমি কিছুতেই কিছু বলতে পারবো না, মুখের দিকে তাকালেই তো মন গলে যায়। সামান্য একটু আশ্রয় চায়, তা-ও তুমি দিতে বারণ করবে আমাকে?'

'তা দাও, আমার আর আপত্তি কী! ভালো হ'লে বরং সুবিধেই, একা একা থাক, মেয়েটা কাছে কাছে ঘুরবে—' উনুনে হাওয়া করতে বসলো নিবারণ।

বছর দুই আগে মহামায়া এই বয়সের একটা ছেলেকে ঠিক এমনি করেই দুঃখের কথা শুনে ডেকে এনেছিলেন বাড়ির ভিতরে। তার জামা কাপড় বই ইসকুল, মহামায়া একেবারে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলেন তাকে মানুষ ক'রে তুলতে, আর সেও সেই সুযোগে

একদিন চুরি ক'রে পালালো। বেশ ভালো হাতেই চুরি করলো। এই বিশ্বাসঘাতকতায় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু আজ সেই কষ্টের কথা মনে পড়লো না তাঁর, এক ফোঁটা অবিশ্বাস হ'লো না, নিবারণের কথায় উৎসাহিত হ'য়ে বললেন, 'ঠিক বলেছো, এই বয়সের এমন একটা সুন্দর মেয়ে ঘরে দুয়ারে ঘুরলেও ভালো লাগে। ওকে আর আমি ঐ দুঃখের মধ্যে যেতে দেবো না কোনোদিন। বড্ড কষ্ট পেয়ে এসেছে, আর যেন কখনো সে যন্ত্রণা ওর ভোগ করতে না হয়। বুঝলে নিবারণ, চার পা থাকলেই পশু হয় না, দুই পায়ের মানুষেরাও তাদের চেয়ে কম না।'

রাশভারি চালে ছোটু এসে দাঁড়ালো, 'ঐ লেড়কিটা কে মা ?'

'ও থাকবে এখানে।'

'থাকবে ? কী করবে ?'

'কী আবার, আমার লাগে না ? তোমাদের কি আমি সব সময়ে হাতের কাছে পাই ?'

'তা দাদাবাবুকে বিয়ে লাগিয়ে দাও না, পরের লেড়কি ঘরের লেড়কি হ'য়ে যাবে, তা বলে যাকে-তাকে এনে তুমি আবার ফ্যাসাদ করবে নাকি ?'

একটু রাগ করলেন মহামায়া, 'ফ্যাসাদ আবার কী করবো ? ঐটুকু একটা মেয়ে আবার আমাকে কী ফ্যাসাদে ফেলবে ?'

'কেন, হারু কি ফেলেনি ? তুমি ভুলছো, হামি ভুলিনি।'

'একটা গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, গৃহস্থ ঘরের বউ, সে কেন হারুর মতো হ'তে যাবে ?'

'সেটাকে ভি তুমি এই বলেছ, শেষে কোতো টাকার গোয়না নিয়ে পালালো।'

'থাক থাক, সে সব থাক', কুসুমকে আসতে দেখে ছোটুকে থামিয়ে এগিয়ে এলেন মহামায়া। মুখ ধুয়ে এসেছে কুসুম, পরিষ্কার কাপড়

পারে এসেছে, শুধু এইটুকু, যেন বর্ষার জল পেয়ে. ফুল ফুটে উঠেছে একটা, চোখভরা হাসি নিয়ে মহামায়ার কাছে এসে দাঁড়ালো, 'পুকুরে অনেক পদ্ম আছে মা. যখন তুপুরে সাঁতার কাটতে নামবো, তুইলে নিয়ে আসবো তোমার জন্মি কেমন ?'

'সাঁতার জানো তুমি ?'

'হ্যাঁ-এ। সব সাঁতার জানি, চিৎ সাঁতার, ডুব সাঁতার, মাছরাঙা— তুমি যদি বলো, আমি এখুনি নামতে পারি। নামবো ?'

'থাক, এখুনি ওসবে দরকার নেই। খেয়ে নাও আগে।' খাবার কথায় একটু লজ্জা হ'লো কুসুমের, মুখ নিচু করলো সে। এই লজ্জাটুকু মহামায়া উপভোগ করলেন, এতো ভালো লাগলো! মায়ায় ভ'রে গেল মনটা। মনে মনে ভাবলেন. যদি শেষ পর্যন্ত হারুর মতো ক'রে পালায়, পালাক। তবু এই মুহূর্তের এতো তুঃখের পরে এই সুখটুকুতে তো ওর কোনো খাদ নেই, মিথ্যা নেই, তাই বা কম কী। আদর ক'রে খেতে দিলেন তিনি, আর খাবার দেখে চোখ বড়ো হ'লো কুসুমের।

'আমাকে দিয়েছ ?'

'আরো লাগলে চেয়ে নিও।'

'না না', সঙ্কোচে তিন হাত সরে গেল সে, লাল হ'য়ে বললো, 'এতো আমি খাবো না। ডালায় ক'রে শুধু চাট্টে মুড়ি দিলেই হবে, আমি খিদে নাগলে তাই খাই।'

'আজ না হয় আমার কাছে একটু বেশীই খেলে।'

তবু কুসুমের লজ্জা যায় না, মহামায়া হাত ধ'রে বসিয়ে দিলেন। বললেন, 'কুসুম, তুমি চা খাও ?'

'না খেইলেও আমার কষ্ট হয় না।'

'তার মানে খাও, কী বলো ?'

'এটু বদভ্যাস হইয়ে গিয়েছে মা', অপরাধী মুখ করলো কুসুম।

'বাপের ঘরে রোজ খেতুম কিনা।'

'কেন, স্বামীর ঘরে খাও না ?'

'ওরা মুড়ি দেয়, আর বাপ চা দিতো।'

'শুধু চা?'

'বেশী কইরে দিতো, আর খিদে পেতো না।'

'আমি চান ক'রে পুজো সেরে যখন চা খাবো, তখন তোমাকেও দেবো, কেমন?'

হঠাৎ খাওয়া থেকে হাত তুললো কুসুম, 'ওমা, তাইতো, তুমি না খেতেই আমি খেনু?'

'তাতে কী হয়েছে? তুমি ছোটো মানুষ, কতো খিদে পেয়েছে।'

'যারা গুরুজন তাদের ফেইলে যে খেইতে নেই।'

'কে বলে খেতে নেই', মহামায়া হেসে বললেন, 'যদি আমার কাছে থাকোই তবে রোজ তাইতো খেতে হবে।'

'আমি খাবোই না।'

'তাহ'লে আমি রাগ করবো।'

'আগ করবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'কেন?'

'ছেলেমেয়েরা খেলে তবে তো মা খায়।'

দু'টি চোখ যেন দু' চামচে জল। মুক্তোর মতো দাঁত দিয়ে সে ঠোঁট কামড়ালো, দু' গালে টোল পড়লো দু'টি। দু'টি জলের রেখা এসে মিশলো।

'কুসুম।'

'মা।'

'তুমি কাজ করতে পারো?'

'কাজ! পারি না!' এর চেয়ে অবাক করা কথা যেন আর শোনেনি সে।

'কী কাজ পারো?'

'সব। আমি সব কাজ করতে পারি।'

'ঘর পরিষ্কার করা, বিছানা পাতা—'

'হ্যাঁ-এ-এ। আমাকে তুমি সব কাজ করতে দিও।' এই বলে তালিকা দিলো সে, 'শুধু কি তাই? সেই বছর যে এতো ধান উঠলো, সব তো আমি মাড়ালাম। তাপর তোমার গিয়ে সেদ্ধ করা আর জন-মুনিষরা যখন খেলো তার আন্না, তাপর—'

'সব তুমি করেছ?'

'আর ওদিকে ধরো গিয়ে অতবড়ো মাটির উঠোনটা, ঝাঁট দিয়েছি রোজ। বিষ্যুতে বিষ্যুতে গোবর নেপা করেছি। পাটে আছড়ে নিত্যি কাপড় কাচি, আন্না করি, বাসন মাজি, খেতে দি—'

'সব একলা করো?'

'সব।'

'তবু শাশুড়ি মারতো?'

'আর শাশুড়ির পা টিপতুম না বুঝি? মাথা এঁইচরে দিতুম, তেল মেইখে দিতুম—'

'তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে।'

প্রশংসা শুনে কুসুম গলে গেল, আগ্রহভরে বললো, 'এখানেও আমি সব ক'রে দেবো, তোমার স-অ-ব কাজ আমি কইরে দেবো। শুধু তুমি আমাকে একটু পেইলে থাকতে দিও, খেইদে দিও না।'

মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মহামায়া। বললেন, 'কিছু ভয় নেই তোমার, এমন ভালো মেয়েকে কি কেউ কখনো তাড়িয়ে দেয়? তোমার যদ্দিন খুশি থাকবে।'

সারা মুখ হাসিতে ভ'রে গেল কুসুমের। খাওয়া শেষ করলো সে। হাত ধুয়ে এসে ঘরের এ কোণ ও কোণ ঝাঁটা খুঁজতে লাগলো। হেসে মহামায়া বললেন, 'শোনো আমার কাছে, তোমাকে অত কাজ করতে হবে না, কেবল সকালে বিকেলে ফুল গাছে জল দেবে একটু, আর—'

'ফুল গাছে।' চক চক করলো কুসুম, 'দেখো না কী পোকার

কইরে ফেইলে দি সব, তুমি দেখে আর চিনতেও পারবে না। ওই খানটায় ক্ষেত বানিয়ে দেবো। দুই যেবার আমায় বড়ো নন্দাইটা লাই বিঁচি এইনে দেছেলো, আমি পুতনু, কী লকলকে ডগা হ'লো, আর লাইও হ'লো খুব—'

মহামায়া সভয়ে হাত তুললেন, 'ওরে বাবা, ওসব তুমি করতে যেয়ো না যেন, ঐ ফুলগাছ হাত দিয়েও ছোঁবে না, বুঝলে? একটা পাতাও ছিঁড়বে না। ফুলগাছ ওরকম ফুলগাছই থাকবে, কেবল ঝারি দিয়ে জল দেবে দু'বেলা।'

'তাই দেবো। তুমি যা বলবে তাই করবো।'

তবু ভয় কমে না মহামায়ার, 'আর শোনো, ফুলগাছ যদি একটুও নষ্ট করো, তাহ'লে তক্ষুনি আমি তোমার স্বামীর কাছে খবর পাঠিয়ে দেবো, বলবো এখানে এসে লুকিয়ে আছ—'

'না মা, না—' মহামায়ার পায়ের তলায় বসে পড়লো কুসুম, 'এই তোমার চরণ ধরছি আমি কিচ্ছু করবো না ফুলগাছের, শুধু এটটু জল দেবো। তুমি আমাকে আশ্ছয়ে এখো।'

মহামায়া তাকে হাত ধ'রে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হাসলেন।

॥ ৮ ॥

মহামায়ার আশ্রয়ে কুসুমের অন্ধকার দিন আলোয় ভ'রে উঠলো। এই ভালোবাসার আস্বাদ সে জানতো না। সে কৃতজ্ঞ হ'লো, কৃতার্থ হ'লো, অভিভূত হ'য়ে মহামায়ার কাছে বিলিয়ে দিলো নিজেকে। মহামায়ারও এমন সুন্দর সরল দুঃখী বঞ্চিত মেয়েটির উপর স্নেহের অন্ত রইলো না।

ভালো তাকে সকলেই বাসলো। নিবারণ আর ছোটু সিংয়েরও কুসুমদিদির উপর মন্দ পক্ষপাত দেখা গেল না। কুসুম সারাদিন সকলের পায়ে পায়ে শিশুর মতো সঙ্গী।

সারাদিন কাজ করছে সে, সারাদিন সকলের মন যোগাচ্ছে, বাড়িতে কারো এতোটুকু অসুবিধে হ'লেও নিজেকে লুটিয়ে দিচ্ছে সেবায়।

তিনজন বয়স্ক মানুষের জীবনে এই মেয়েটি একটি নতুন প্রাণের সঞ্চার করলো। বাড়িটা ভরলো।

মহামায়া জিজ্ঞাসা করলেন, 'লিখতে পড়তে জানিস ?'

'হ্যাঁ-এ।'

'কী জানিস ?'

'আমার নাম লিখতে জানি।'

'তবে তো খুবই বিদ্বান।'

'তুমি যদি শেখাও তাহ'লে আরো শিখবো।'

অতএব শ্লেট পেনসিল এলো, খাতা বই এলো। কিন্তু পড়তে বসলেই উঠি উঠি। মহামায়া ছাড়েন না। নানারকম গল্প বলেন, উচ্চারণ শেখান, দুস্থুকে দুংখ বলাতে দিন কেটে যায়। তা যাক, মহামায়া অধৈর্যহীন, নতুন শিশুর মায়ের উৎসাহে সারাদিন লেগে থাকেন পিছনে।

এর মধ্যেই পোষাক-আসাক এসে গেছে অনেক। মেয়ে নেই, মেয়ের সাধ মিটিয়ে নিচ্ছেন এই মেয়ে দিয়ে। রঙিন শাড়ি এসেছে, জামা এসেছে, তেলজলহীন অযত্নরক্ষিত জটপরা মস্ত চুলের খোঁপাটা তৈলচিক্কণ হয়েছে, চেহারা বদলে যাচ্ছে কুসুমের, ধরন বদলে যাচ্ছে, দেখতে ভালো লাগে মহামায়ার।

মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী রে থাকবি তো ?'

এ আবার একটা কথা। চোখ তুলে তাকায় কুসুম।

'না কি দু'দিন পরে পালাবি।'

কুসুমের কান্না পেয়ে যায়।

'তুই এসেছিস, এর মধ্যেই দু' মাস হ'য়ে গেল।'

'মা, তোমার আশ্ছয় ছেড়ে আর আমি কোথাও যাবো না।' ভাঙা ভাঙা শোনায় কুসুমের গলা, ব্যাকুল হ'য়ে বলে, 'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিও না।'

'আবার আশ্ছয় বলছিস ?' তক্ষুনি মহামায়া ভুল শোধরাতে বসেন।

'কী বলবো ?'

'আশ্রয়।'

'আশ্ছয়।'

'আশ্রয়।'

'আশ্ছয়।'

'বোকা মেয়ে। বল আস্—'

'আস্'

'রয়'

'রয়'

'আশ্রয়—'

'আশ্ছয়।'

'অসম্ভব। অসম্ভব। আমার যে একজন ছেলে আছে জানিস তো।'

'জানি।'

'সেই দাদাবাবু যখন আসবেন, তখনো যদি এই রকম বলিস তাহ'লে কিন্তু ভীষণ মুস্কিল হ'য়ে যাবে।' কুসুমের চোখ বড়ো হ'য়ে ওঠে। নিবারণ এসে দাঁড়ায়, ভুরু কুঁচকে বলে, 'এসব তুমি ছাড় তো বৌমা, ওরকম ক'রে কক্ষনো শেখানো যায় না।'

'তবে কী রকম ক'রে শেখাবো।'

'ও নিজে থেকেই হবে। তোমারটা শুনে শুনেই হবে। আর না হয় নাই হবে।'

অথৈ জলে পড়ে যান মহামায়া, 'এ তুমি বলছো কী নিবারণ, চিরদিন ও আশ্রয়কে আশ্ছয় বলবে নাকি? বলবে কি সবাই?'

'সবাইটা কে শুনি?'

'ধরো, সমু যখন আসবে—'

এতোক্ষণ একমনে কুসুম ঠোঁট নেড়ে নেড়ে বিড় বিড় করছিলো, দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে সাংঘাতিক পরিশ্রমে বলে উঠলো 'আশ্রয়।' আনন্দে উচ্ছুসিত হ'য়ে মহামায়া তার মাথা নেড়ে দিলেন, 'এইতো

পেরেছে। কেমন, তুমি না বলছিলে পারবে না?' গর্বের সঙ্গে নিবারণের দিকে তাকান। নিবারণ হাসে। পাকা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'নাঃ, এটাকে তুমি দেখছি ঠিকই মানুষ ক'রে তুলবে।'

কিন্তু শুধুই কি উচ্চারণ? চাল-চলন শেখানোও কম দুরূহ কর্ম নয়। আর সেই কারণেই তিনি আজকাল ঘন ঘন তাঁর দেওরঝি ভাসুরঝিদের ডেকে পাঠান, নিমন্ত্রণ করেন। এসব মুখে মুখে শেখানো যায় না, এর জন্য মিলতে হয়, মিশতে হয়, দেখতে হয়, বন্ধুতা করতে হয়।

বলেন, 'শোন, শাড়িটা ওবকম ক'রে পরবি না, বুঝলি?'

অবাক চোখে তাকিয়ে কুসুম বলে, 'কেমন ক'রে পরবো?'

'আরো নামিয়ে দে, গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে দে—'

'হোঁচট খাবো যে—'

'হোঁচট খাবি কেন?'

'ঠিক ও বাড়ির রমাদির মতো ক'রে পরবি।'

'শাড়িটা যে বড্ড বড়ো গো মা।'

'বড়ো আবার কোথায়? তুই-ই কি খুব ছোটো মেয়ে নাকি? উঁচু ক'রে পরলে আমি বকবো।'

'বকবে?'

'খুব বকবো।'

কুসুম তখুনি শাড়ি নামাতে চেষ্টা ক'বে ব্যর্থ হয়। মহামায়া তাকে দেখিয়ে দেন, 'এই ছাখ, আমি কেমন ক'রে পরেছি, আমি কি তোর মতো অত উঁচু করেছি?'

হেসে ফেলে কুসুম, 'মা যে কী বলে—তুছি আর আমি বুঝি এক হলাম!'

'আলাদা কিসে?'

'বা, তুমি কতো বড়ো নোক, আজার আনি, আর আমি হলাম

নেতাই কৈবর্ত্তের মেইয়ে।'

'উঃ।' বসে পড়েন মহামায়া। 'আবার তুই নোক বলছিস? আজা বলছিস? আনি বলছিস?'

'কী বলবো?'

'জানিস না কী বলবি?'

মাথা নীচু করে কুসুম, আস্তে বলে, 'জানি।'

'কী জানিস বল।'

'বড়োনোক নয়. বড়োলোক, আজা নয়, রাজা, আনি নয়, রাণী।'

'এই তো ঠিক বলেছিস। বেশ, এবার বল কী বলছিলি।'

'বলছি যে তুমি তো বড়োলোক, রাজার রাণী—'

'আর তুই?'

'তুমিই বল।'

'আমি যা বলি তা কি তুই শুনিস?'

'হ্যাঁ-এ-এ—'

'তবে এসব ভাবিস কেন?'

'কী সব।'

'বড়ো ছোটো কিছু নেই', গম্ভীর হ'য়ে ধমকান মহামায়া, 'ওরকম সব সময় নিজেকে ছোটো ভাবতে হয় না।'

ভয় পেয়ে কুসুম বলে, 'তবে কী ভাববো।'

'কী আবার? সবাই যেমন, তুই-ও তেমনি।'

কুসুম মুখ ভার করে, 'তাই বলে আমি আর তুমি বুঝি সমান?' এতো বড়ো অন্যায়টা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না।

মহামায়া বলেন, 'আমার সমান তুই কী ক'রে হবি? আমি তো তোর চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো।'

'বড়ো ছোটো বুঝি বয়েস দিয়ে হয়?'

'তবে আবার কিসে হয়?'

'ভদ্দর লোকেরা বড়ো, ছোটো লোকেরা ছোটো।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'কে বলেছে ?'

'কেউ বলেনি, আমি নিজে নিজে জানি।'

'ভয়ানক পণ্ডিত। এতো পাণ্ডিত্য রাখবি কোথায় ?'

'তুমি কেবল ঠাট্টা করো।'

'ঠাট্টা করবো কেন. কতো জানিস তুই, কতো শেখাচ্ছিস—'

'যাও, তোমার সঙ্গে আর কথাই বলবো না।'

'তা না বললি, শুধু এইটা বল যে ভদ্রলোক কাকে বলে আর ছোটোলোক কাকে বলে।'

'আমি জানি না।'

'জানিস না তো বলিস কেন ?'

'বলবো না ?'

'না। যে কথার অর্থ জানিস না, সে কথা কখনো বলবি না। আর ঠিক আমার ভাসুরঝি রমা যেমন ক'রে শাড়ি পরে, ওরকম ক'রে শাড়ি পরবি।'

'আমি কেমন ক'রে রমাদির মতন পরবো ?'

'কঠিন কী ?'

'রমাদি কতো সুন্দর, কতো লেখাপড়া জানে'—

'ঐ জন্য তো তোকেও লেখাপড়া করতে বলি, তা তো তুই করবি না. ছোটোলোক হ'য়ে থাকতেই তুই ভালোবাসিস।'

'এই তো তুমি ছোটোলোক বললে।'

'লেখাপড়া না জানলেই ছোটোলোক।'

'লেখাপড়া জানলেই ভদ্দরলোক হ'য়ে যায় ?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি কি লেখাপড়া শিখতে পারবো ?'

'কেন পারবি না ?'

'শিখে শেষে কী হবো ?'

'কতো বড়ো হবি, কতো ভালো চাকরি করবি, আমি বুড়ো হ'য়ে গেলে আমাকে খাওয়াবি।'

'য্‌যা', কুসুম লজ্জা পেয়ে লাল।

মহামায়া তাকে কাছে টেনে আনেন. হাত বুলিয়ে দেন পিঠে, তারপর শাড়িটা নিজেই পরিয়ে দেন রমার মতো পিছনে আঁচল দিয়ে।

'রোজ এ রকম পরবি, বুঝলি ?'

লজ্জিত মুখে মাথা কাত করে কুসুম, তার সারাজীবনের সকল দুঃখ জুড়িয়ে যায়।

॥ ৯ ॥

প্রথমে একতলার একটি ঘরে শোবার বন্দোবস্ত ছিলো কুসুমেব। এবার তাকে মহামায়া দোতলার বারান্দায় নিয়ে এলেন। বললেন, 'আমার কাছেকাছেই থাক।'

খুশিতে উদ্বেল হ'য়ে উঠলো কুসুম। যতোটা সম্ভব মহামায়ার কাছেই তো থাকতে চায় সে। নতুন বিছানাও হ্য়েছে সেই সঙ্গে, সুতরাং সন্ধ্যাবেলা কাচ-ঢাকা বারান্দার কোণে, যেখান থেকে স্পষ্ট মহামায়ার ঘর দেখা যায়, সেখানে পরিপাটি ক'রে পেতে নিলো বিছানা। সারা বাড়িতে ঐ তিনটি মানুষ। নিবাবণ, ছোটু সিং আর মহামায়া, সুতরাং মহামায়াকে বাদ দিয়ে এই অপ্রত্যাশিত সুখের খবরটা ছোটু সিং আর নিবারণের মধ্যেই গিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ বার সে বণ্টন ক'রে এলো।

'জানো নিবারণদা, আজ আমি দোতলায় মা'র ঘরের পাশে বারান্দায় শোবো, বুঝলে ?'

নিবারণ বললো, 'বেশ।'

'বুঝলে ছোটু ভাই, মা যদি আমাকে অনেক রাত পর্যন্ত পড়তেও বলেন, তাও পড়বো, বুঝলে ?'

ছোটু ভাই বললো, 'সে ভি খুব ভালো হোবে।'

'জানো তো, পড়াশুনো শিখলে জ্ঞান হয় বুদ্ধি হয়, তখন আমি

দাদাবাবুর সমান চাকরী ক'রে মা বুড়ো হ'য়ে গেলে মাকে খাওয়াবো, বুঝলে ?'

এবার হাসতে হাসতে নিবারণ বললো, 'তা জানি গো জানি, এ বাড়িতে তুমি যে আবার মায়ের কোলের লক্ষ্মী কোলে ফিরে এসেছ এ আমি বুঝে নিয়েছি।'

কা'র কোলের লক্ষ্মী কা'র কোলে ফিরে এসেছে সে কথায় কান দেবার প্রয়োজন বোধ করলো না কুসুম, হৃদয়ঙ্গম করতেও চেষ্টা করলো না। মনের সুখে সে ছেলেবেলায় বৈরাগীর মুখে শোনা একটা পাকা দেহতত্ত্বের গান ধরলো, 'এ হেন সোনার সংসার তোমার, কে বলে অসার বিষের ভাণ্ডার ; হরি, তুমি ভিন্ন ঠাঁই খুঁজিয়া না পাই, আমি যেদিকে তাকাই সেদিকে তুমি।'

ঠাকুরঘরে পুজোয় বসে নিবারণের কথাটা গিয়ে তীরের মতো বিদ্ধ হ'লো মহামায়ার বুকের মধ্যে। লক্ষ্মী! লক্ষ্মী কে ছিলো। কবে ছিলো। কী ছিলো। কী বললো নিবারণ। কেন বললো? কেন তার এমন কথা মনে হ'লো আজ এতোদিন পরে? তবে সত্যি কি মৃত্যুর পরে মানুষের আর এক জন্ম আছে? এক রূপ ছেড়ে আর রূপ পরিগ্রহ? এক খোলস ছেড়ে আর এক খোলস? পুজো ভুলে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলেন তিনি।

স্মৃতির ঝাপসা কাচের ওপিঠে স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে চাইলো—একটি দশ বছরের বালিকার অবয়ব। একাগ্র হ'য়ে তিনি তার চোখ মুখ হাত পা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে পড়াবার চেষ্টায় বিহ্বল হলেন। কী আশ্চর্য! একদিন যার মৃত্যুশোকে তাঁর বুকের হাড় পাঁজর খসে গিয়েছিলো, যার জন্য দিনের পর দিন তিনি আকণ্ঠ অন্ধকারে তলিয়ে ছিলেন, সেই মানুষকে আজ আর ভালো ক'রে মনেও পড়ে না, নিবারণ না বললে হয়তো পড়তোও না, পড়লেও এই বেদনা নিয়ে আঘাত করতো না। তবে কি তিনি তাকে ভুলে গিয়েছিলেন! সত্যি ভুলেছিলেন? সত্যি কি ভোলা যায়?

তাই যদি না হবে তবে এতোদিন কেন মনে পড়েনি? কালের প্রলেপের শাসন কি এতোই ভয়ঙ্কর। এমন ক'রে সব ভুলিয়ে দেয়! না দিলে মানুষ বাঁচে কী ক'রে। ঈশ্বর এক হাতে দেন, অপর হাতে নেন; এক হাতে নেন, অপর হাতে দেন। নদীর এক কূল ভাঙে, অন্য কূল জোড়ে। কী সুন্দর নিয়ম। কী সুন্দর পারিপাট্য, আর পরিমিতি এই জগতের। মহামায়া চোখ বুজে গুনগুন করলেন,

তাই তো তুমি রাজার রাজা হ'য়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছো কত মনোহরণ বেশে
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।

কবেকার সেই পুরোনো দুঃখের তীব্রতার স্বাদ অনুভব করবার জন্য আজ আবার নতুন ক'রে বুকটা যেন হাহাকার ক'রে উঠলো মহামায়ার, তিনি কাঁদতে চাইলেন, কান্না পেলো না।

দশমাস দশদিন পেটে ধরেছিলেন তাকে, অসহ্য প্রসব-বেদনার মধ্যে জন্ম দিয়েছিলেন, তিল তিল ক'রে মানুষ করেছিলেন, নিজের জীবনের কতো সুখ সুবিধে উৎসর্গ ক'রে তবে একটি প্রাণকণিকাকে দশ বছর বয়সে উত্তীর্ণ করাতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে রইলো না, অভিমানিনীর মতো রাঙা ঠোঁট আরো রাঙা ক'রে ফুলিয়ে চলে গেল। কী তাপ গায়ের, যেন ফেটে যাচ্ছিলো, পুড়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু জ্বরের তাপে লক্ষ্মীর গা যতোই পুড়ুক শোকের তাপে লক্ষ্মীর মায়ের বুক যে আরো কতো বেশী পুড়েছিলো তার কি কোনো তুলনা ছিলো?

॥ ১০ ॥

তাঁর প্রথম সন্তান লক্ষ্মী, বিয়ের ছ'মাস পরেই যার জন্মের সূচনা হয়েছিলো, যার সূচনাতে সুখী না হয়ে কেঁদেছিলেন মহামায়া। অত তাড়াতাড়ি মা হ'তে সাধ ছিলো না তাঁর। হয়তো সেই অনিচ্ছার কুসুম বলেই এমন ক'রে দাগা দিয়ে চলে গেল। কে জানে আবার

হয়তো এই কুড়িয়ে পাওয়া কুসুমের মধ্যেই সে ফিরে এসেছে তার দুঃখিনী মায়ের কাছে। জন্ম মৃত্যুর এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কে কবে সমাধান করতে পেরেছে? নইলে সত্যিই তো, কুসুমকে এতো সুনজরে দেখলেন কেন তিনি? এইটুকু সময়ের মধ্যে কেন এমন টান হ'লো?

শ্বশুর বেঁচে ছিলেন তখন, বাপ হ'য়ে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, সন্তান হ'য়ে তিনি ভুলিয়ে দিয়েছিলেন সেই শোক। তার পর ক্লাশ নাইনের বিদ্যাওলা বধূকে নাকে চশমা এঁটে পড়িয়ে ম্যাট্রিক পাশ করিয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের চার খণ্ড মহাভারতের বিশেষ বিশেষ অংশ পড়ে শুনিয়ে এই মায়াময় সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। শেষে বাড়িতে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, প্রশান্তহাস্যে বললেন, 'নাও বৌমা, কতো শিশু মানুষ করতে চাও, করো। সব শিশুর মধ্যেই তুমি তাকে পাবে।'

তা পেয়েছিলেন। দগদগে ঘায়ে প্রলেপ পড়েছিলো। কিন্তু সে রামও রইলো না, সে অযোধ্যাও রইলো না। শ্বশুরের মৃত্যুর পরে স্বামীর সাহায্যে নিজের আগ্রহে অনেকদিন চালিয়েছিলেন সেই অবৈতনিক বিদ্যালয়, একবার কঠিন অসুখ করলো, বিছানায় পড়ে রইলেন তিন মাস, আস্তে আস্তে উঠে গেল।

আর কী-ই-বা রইলো শেষ পর্যন্ত, স্বামীও তো গেলেন। সব শূন্য ক'রে দিয়ে শিশুপুত্রের সব ভার মাথায় চাপিয়ে লক্ষ্মীর মতো ক'রে তিনিও তো চলে গেলেন একদিন। আবার দশদিক আঁধার ক'রে ঝড় এলো, বিদ্যুৎ চমকালো, বাজ পড়ে মারা গেলেন, কেউ রইলো না দেখবার। লক্ষ্মীর মৃত্যুর পরে পিতৃতুল্য শ্বশুরের স্নেহের আশ্রয় ছিলো, প্রেমময় স্বামীর বুকের আশ্রয় ছিলো, স্বামীর মৃত্যুর পরে আর কেউ রইলো না, কেউ রইলো না।

রইলো না! রইলো বৈ কি। বাড়ির চাকর নিবারণ আবার বাপ হ'য়ে তাঁকে হাত ধ'রে উঠিয়ে বসালো, ছোটু সিং তার আদরের

খোকাবাবুর বৌকে বুক দিয়ে আগলালো। খবর পেয়ে মাতৃপিতৃহীন মহামায়ার কর্তব্য-পরায়ণ কাকা যখন বিরক্তিসহকারে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হ'লে এখন তুমি কী করবে? এখানেই থাকবে, না আমার সঙ্গে যাবে?' মহামায়া চুপ ক'রে ছিলেন। বিধবা ভাইঝির দায় নিতে বিরক্ত কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা তাঁর সাতহাত দমে গিয়েছিলো। তিনি জানতেন তিনি নিরুপায়, এই এতোবড়ো বাড়িতে ঐ গুড়োটুকু সম্বল ক'রে থাকা কোনোমতেই তাঁর সম্ভব নয়। বই-পাগল অন্যমনস্ক সত্যসুন্দর বাবু স্ত্রীপুত্রের জন্য দু'হাজার টাকার একটি লাইফ ইনসিওর ভিন্ন আর কোনো সঞ্চয়ই রেখে যাননি। শোক যতো প্রবলই হোক, জীবন যতো দুর্বহই হোক, পেট তো কোনো কথাই শুনবে না। তার চাহিদা বড়ো ভীষণ, সকল ছাপিয়ে নদীতে চরের মতো জেগে ওঠে সে। যদি তিনি একা হতেন, সোমেনের ভার না থাকতো, ঝাঁপ দিতেন আগুনে, ডুবে মরতেন ঐ পূর্বপুরুষের বাঁধানো-ঘাট মজা পুকুরের জলে, আম কাঁঠালের ডালে ঝুলে পড়তেন গলায় দড়ি দিয়ে। কতো কী করবার স্বাধীনতা ছিলো। যখন নিয়ে গেল মানুষটাকে, ছিঁড়ে নিয়ে গেল তাঁর বুক থেকে, যেতেন সঙ্গে সঙ্গে, চিতা তো সাজানোই ছিলো। কিন্তু তাকে অবলম্বন ক'রে যে আরো একটি দশ বছরের প্রাণ দুই চোখে জল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো দরজার কোণে, যার ছোট্ট বুকটা থেকে থেকে ঝোঁকে ঝোঁকে কেঁপে উঠছিলো, নজর পড়ে গেল তার দিকে। সত্যসুন্দর নিষ্ঠুর নন, এইতো কতো বড়ো সান্ত্বনা রেখে গেছেন তিনি, কতোবড়ো দায়িত্ব। একে বুকে ক'রেই ভুলতে হবে সব, সব মেনে নিতে হবে।

কিন্তু কেমন ক'রে মেনে নেবেন, কেমন ক'রে পালন করবেন এতোবড়ো দায়িত্ব! সম্বল কই? সহায় কই? খুড়শ্বশুর, এসে দাঁড়িয়েছিলেন বটে, চোখের জলও ফেলেছিলেন, কিন্তু বলেননি—ভয় কী তোমার, আমিই তো আছি। শাশুড়ীও এসেছিলেন, তিনিও কেঁদেছিলেন, তিনিও ভরসা দেননি কোনো। ভাসুর দেওর সবাই এসেছিলো, মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করেছিলো বালকপুত্র নিয়ে,

এখন কী ক'রে দিন চলবে মহামায়ার, আর তারাই সভয়ে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছিলো কাকাকে, যাতে তিনিই এসে তাদের মেয়ের এই দায় মাথায় তুলে নেন, যেন তাদের ঘরে গিয়ে তাদের ঘাড়ে চড়াও না হন।

কাকার কথার উত্তরে মহামায়াকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে শ্বশুর ব্যস্ত হ'য়ে বলেছিলেন, 'না না, এখুনি নিয়ে যান আপনি, একা বাড়িতে পড়ে থাকলে তো আরও খারাপ লাগবে। হাজার হোক, আপনাদের কাছে, আপনাদের স্নেহযত্নেই মানুষ, মা বাপ বলতেও আপনারা, আপন জন বলতেও আপনারা, এই দুঃসময়ে আপনাদের কাছে না গেলে যাবে কোথায়? আর আমরাও তো আছি, আবার আসবে বৈ কি, দু'চারদিন থাকবে দেখবে শুনবে, আবার চলে যাবে। তারপর ঐ ছেলেই যখন একদিন মানুষ হ'য়ে উঠবে তখন আর কিসের দুঃখ?'

হঠাৎ নিবারণ, ছোটু আর উদয় মালী তিনজনই একসঙ্গে এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়ালো, 'একটা কথা আছে কর্তাবাবু।'

তিনটি শোকার্ত উদ্‌ভ্রান্ত ভৃত্যের এই নাটকীয় উপস্থিতিতে সবাই সচকিত হয়েছিলো। খুড়শ্বশুর বললেন, 'কী কথা।'

'বৌমাকে আমরা এ বাড়ি ছেড়ে যেতে দেবো না।

'কী।' ভুরু কুঁচকে, চশমা নামিয়ে ভালো ক'রে নজর করলেন তিনি। নিবারণ বললো, 'আমরা থাকতে বৌমার ভয় কী?' ছোটু বললো, 'হামারা কি কর্তাবাবুর নিমক খাইনি?'

মালী বললো, 'সত্যকে আমি এইটুকু থেকে কোলে কাঁখে করেছি, বিয়ের সময় সঙ্গে গিয়েছি, হাতে ধ'রে কর্তাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে তুলেছি, আমরা যতোক্ষণ আছি, কিছুর জন্যই ভয় নেই বৌমার। যেতেও দেবো না কোথাও। অবিশ্যি বৌমা নিজে যদি যেতে চান—'

শান্ত সংযমী সীমাহীন ধৈর্যময়ী মহামায়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিলেন একথা শুনে। ঈশ্বরকে আর ততো কৃপণ মনে হয়নি।

॥ ১১ ॥

তারপর কী থেকে কী হ'লো। কী না হ'লো। দেখতে দেখতে পরিষ্কার হ'য়ে গেল পানাপচা মস্ত পুকুর, মাছ ছাড়া হ'লো সেই পুকুরে, বাৎসরিক বরাদ্দ দেয়া হ'লো দরাননিকিড়িকে, আম জাম কাঁঠাল কলা আর নারকেলের সারি ইজারা দেয়া হ'লো ব্যবসায়ীদের, পুরোনো ফুল-বেচা ব্যবসায় মন দিলো উদয় মালী। মহামায়ারটা দিয়েই মহামায়াকে ঘিরে রাখলো তারা। মহামায়া নতুন ক'রে মেতে উঠলেন সংসার রচনায়, আপন পরিশ্রমের উপার্জনে। বুদ্ধি একটা থেকে আর একটায় খেলতে লাগলো। মা আর ছেলেব সংসারের ছোট্ট নৌকোটি ধীরে ধীরে দুলে দুলে পার হ'তে লাগলো দুস্তর সমুদ্র। তিনটি ভৃত্যই মায়না নিতো না তখন, তারপর তারও ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। হঠাৎ একদিন মহামায়া অনুভব করলেন, নৌকা তার ফুটো নয়, আস্ত, শক্ত নতুন। ভাগ্য তাকে অনেক বঞ্চনা করলেও নিঃস্ব করেনি, সেই দেয়া আর নেয়া, নেয়া আর দেয়া। সোমেন তাজা ঘোড়ার স্বাস্থ্য নিয়ে, বাপ ঠাকুর্দার তুখোর মগজ নিয়ে দেখতে দেখতে পার হ'য়ে গেল ছাত্রজীবনের সব ক'টা সিঁড়ি। সোমেন বড়ো হ'লো, সোমেন মানুষ হ'লো, সোমেন উপার্জনক্ষম হ'লো, সোমেন কী না? সোমেন নম্র, বাধ্য, সুন্দর, সরল, ব্যক্তিত্বময় পুরুষ। সন্তানের মধ্যে যে যে গুণের সমষ্টি দেখলে মায়ের প্রাণ পরিপূর্ণ আনন্দে ভ'রে ওঠে, সব গুণ সোমেনের মধ্যে আছে।

লক্ষ্মীর কথা তো ওঠেই না, সোমেনের বাল্যকালও আর মহামায়াব মনে পড়ে না ভালো ক'রে। কবে তাকে লিখিয়েছেন, পড়িয়েছেন শিক্ষায় সহবতে বড়ো ক'রে তুলেছেন। সব ঝাপসা মনে হয়। অবিশ্যি সোমেনের অতি শৈশবে হাতে-খড়িটা তাঁর কাছে হয়নি। লক্ষ্মীর মৃত্যুর তিন বছর পরে জন্মেছিলো সোমেন। মেয়েকে হারাবার বেদনায় সেই বয়সে জগৎ সংসার তাঁর নিরর্থক মনে হয়ে-

ছিলো। জীবনের প্রথম শোক সামলাতে সময় লেগেছিলো। সোমেনকে ভালোভাবে দেখাশুনা করবেন এমন আগ্রহ আর অবশিষ্ট ছিলো না মনের মধ্যে। এই ছেলে তার বাপ আর দাদুর বুকে বুকেই মানুষ, তাঁরাই লেখাতেন, শেখাতেন, গল্প বলতেন, ঘুম পাড়াতেন। তাছাড়া তাঁদের পেশাই ছিলো মাষ্টারি, শিশুশিক্ষায় তাঁদের আগ্রহ এবং দখল দুই-ই অসামান্য ছিলো। বই আর বাগান। দু'টোরই সমান নেশা। এক সময়ে যেমন ছাত্রদের কাকলিতে বাড়ি মুখর থাকতো, তেমনি বাগানবিলাসীরাও ভিড় করতেন বাগানের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানতে। অল্প বয়সে বিপত্নীক শ্বশুরের শেষ নেশা হ'লো এই নাতি। সোমেনের পাঁচ বছর বয়সে মারা গেলেন তিনি। আর দশ বছরে তাঁর ছেলে।

সোমেনকে সম্পূর্ণভাবে দেখাশুনার ভার বলতে গেলে সেই সময়েই মহামায়া নিয়েছিলেন। পুত্রবৎসল সত্যসুন্দর মৃত্যু দিয়েই এই বন্ধনে জড়িয়ে রেখে গেলেন তাঁকে। অভাবে অভিযোগে, শোকে বেদনায় এই শিশুপুত্রের দায়িত্ব বহন করতে করতে লক্ষ্মীকে আর মনে রাখবার সময় পাননি তিনি। তার ভালোমন্দ ভাবতে ভাবতেই আবার আলো ফিরে এলো সংসারে, দেহে রক্ত ফিরে এলো, কলিজায় প্রাণ সঞ্চার হ'লো। মনে হ'লো ভাগ্যিস ও জন্মেছিলো।

মানুষ কেবল নতুন আশার দিকেই অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, বসন্তের গাছের মতো কালের প্রলেপে মানুষের মনেও নতুন পাতার উদ্গম হয়।

কিন্তু নিবারণ আজ কোন অতীত টেনে নিয়ে এলো তাঁর কাছে? এ কথা তো কখনো মনে হয়নি। কুসুম দুঃখী, কুসুম নির্যাতিত, কুসুম সুন্দর, সুকুমার, সরল আশ্রয়প্রার্থী, এই হিসাবেই তাকে দেখেছেন তিনি, তাকে গ্রহণ করেছেন, ভালোবেসেছেন। কিন্তু কুসুম যে তাঁর কোলের লক্ষ্মী আবার কোলে ফিরে এসেছে এ কথা কি স্বপ্নেও

ভেবেছেন? অথচ ভাবতে পারতেন। চিন্তা করলে তাঁর প্রতি কুসুমের, অথবা কুসুমের প্রতি তাঁর এই যে একটা অস্বাভাবিক পারস্পরিক টান এটা কি একটু অদ্ভুত নয়?

পুজো শেষ ক'রে উঠলেন তিনি। তারপর সারাদিন আনমনা হ'য়ে রইলেন।

আর তারপর কুসুমকে যেন একটা নতুন চোখে দেখতে শুরু করলেন। সারা বাড়িতে কুসুমের চঞ্চল পায়ে ঘুরে বেড়ানো, ঘর গুছানো, কাপড় কুঁচানো, অজস্র কৌতূহলে ভরা অকারণ প্রশ্নবাণ সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা নতুন অর্থ খুঁজে পেলেন।

সোমেনের বাবার একটি আবক্ষ ফটো টাঙ্গানো ছিলো তাঁর ঘরে, হঠাৎ একদিন কী খেয়ালে কুসুম কেউ কিছু না বলতেই টুলের উপর দাঁড়িয়ে ফটোটা নামিয়ে পরিষ্কার করলো, তারপর এক ছড়া মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দিয়ে লজ্জা লজ্জা চোখে বললো, 'আমি জানি এই ছবিটা কা'র।'

মহামায়া হেসে বললেন, 'বলতো কা'র?'

'বাবার।'

কুসুমের মুখে বাবা শব্দটা শুনে বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো মহামায়ার। তিনি যেন ঠিক লক্ষ্মীর গলার আওয়াজটাই পেলেন কুসুমের মধ্যে। ছটফটিয়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে রইলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। তারপর হঠাৎ ঘরে এসে ব্যাকুলভাবে জড়িয়ে ধ'রে আদর করলেন কুসুমকে।

দোতলায় পাশাপাশি তিনখানা ঘর, আর ঘরসংলগ্ন ঢাকা টানা বারান্দা কাচের জানালা বসানো। পূব কোণের ঘরটা বারোমাসই সাজানো থাকতো সোমেনের জন্য, আর এই কোণে পশ্চিম-দক্ষিণের ঘরে তিনি থাকতেন। মাঝের ঘরখানা কাপড়ের আলমারী, ড্রেসিং টেবিল, সোমেনের বাবার কিছু বই, আলনা জুতো, এ সমস্ত দিয়েই ভরা ছিলো। পরের দিন সকাল থেকে সেই ঘরখানাকে ধুয়ে

মুছে, সাজিয়ে গুছিয়ে খাট পেতে একেবারে ফিটফাট ক'রে তুললেন।

কুসুম বললো, 'কা'র জন্য এতো সাজাচ্ছ মা? দাদাবাবু আসবেন?'

'না। আর দাদাবাবু এলেই বা কী, তার তো আলাদা ঘরই আছে।'

'তবে?'

'তুই থাকবি।'

'আমি?'

'এ বাড়িতে আমরা তিনজন, তিনখানা ঘর হ'লো, বেশ হ'লো না?'

'এই ঘরে আমি থাকবো?' বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চাইলো না কুসুমের। মা তাকে ভালোবাসেন, ভালো রাখেন, ভালো জামা কাপড় পরতে দেন, ভালো খেতে দেন, কুসুমের পক্ষে সেটাই পরমাশ্চর্য, কিন্তু এতো বেশী যেন ভেবে উঠতে পারলো না সে।

মহামায়া সস্নেহে বললেন, 'সুন্দর ক'রে গুছিয়ে থাকবি, বুঝলি?'

'আমি। আমি থাকবো? একা।'

'আর কে আছে বাড়িতে শুনি?'

'ঐ খাটটা?'

'তোর।'

'ঐ বিছানা?'

'তোর।'

'আমার?'

'এই ঘরের সব তোর। তুই থাকবি, তুই শুবি, তুই লেখাপড়া করবি—'

খাটের ধবধবে বিছানার দিকে এক পলকে তাকিয়ে রইলো কুসুম।

মহামায়া বললেন, 'পছন্দ হয়েছে?'

'আর এই ফুটো ফুটো মশারিটা?'

'ফুটো ফুটো মশারি না, নেটের মশারি। এই মশারির তলায়ও তুই-ই ঘুমুবি।'

'না।'

'কী না?'

'আমি শোবো না।'

'তবে কী করবি? বসে থাকবি সারারাত?'

'আমি মাটিতে মাদুর পেতে ঘুমিয়ে থাকবো।'

'বিছানার থেকে কি মাদুরে বেশী আরাম?'

'জানি না।'

'জানিস না, জেনে নে।'

'না না।'

'কেন, বিছানায় শুলে কি তোকে কিছুতে কামড়াবে?'

'আমার ভয় করবে।'

'কিসের ভয়?'

'তা জানিনে।'

'বোকামি করিসনে।

'মা।'

'আমাকে মা ডাকিস কেন?'

'তুমি যে মা।'

'আমি যদি তোর মা হই, তা হ'লে আমি যেমন ক'রে থাকবো, তুই-ও তো তেমন ক'রেই থাকবি।'

'কিন্তু—'

'আমি কি রাত্রিবেলা মেঝেতে মাদুর পেতে ঘুমোই?'

'না।'

'তবে?'

'কিন্তু—'

'আমি যে কাল পড়া দিয়েছিলাম, করেছিলি?'

'না।'

'তবে যা, ঐ চেয়ারে টেবিলে বসে সব পড়া মুখস্ত ক'রে ফেল।'

'মা—'

'আমার দেওরঝি রমা, ঠিক তোর সমান, কতো পড়ে দেখেছিস তো?'

'হ্যাঁ।'

'তোকেও ঐ রকম পড়তে হবে। আর ঐ রকম পড়াশুনো করতে হ'লে এই রকম ক'রে থাকতে হয় বুঝলি?'

'হ্যাঁ।'

'রোজ রোজ আমি কতো বই পড়ে শোনাবো, নিজে পড়তে শিখে নিবি তবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার যখন চোখ খারাপ হ'য়ে যাবে, তখন বেশ তুই পড়ে শোনাতে পারবি। ভালো না?'

'খুব ভালো।'

'তবে যা, এবার নিজের ঘরে গিয়ে নিজের মনে পড়াশুনো কর। ভেবে ছাখ তো এই তিনমাসে তুই কতো শিখে ফেলেছিস, এক বছর পরে তোকে আর কেউ চিনতেই পারবে না।'

'আমি বদলে যাবো বুঝি?'

'একেবারে।'

'সে বেশ হবে, তখন আর ওরা এলেও খুঁজে পাবে না।'

'কারা? ও', হাসলেন মহামায়া, 'তা এখনো বোধহয় চিনতে পারবে না।'

'পারবে না?'

'উঁহু।'

খুশিতে একেবারে ঝলমল ক'রে উঠলো কুসুম।

'তা হ'লে এবার যা, যাতে একেবারে বদলে যাস তার চেষ্টা কর গিয়ে নিজের ঘরে বসে।'

মহামায়া বিছানায় এলিয়ে দুপুরের বিশ্রামের উদ্যোগ করলেন।

॥ ১২ ॥

অগত্যা কুসুম ঢুকলো এসে তার নতুন সাজানো ঘরে। ভঙ্গিতে মনে হ'লো বুঝি চুরি করতে ঢুকেছে। প্রথমটায় ঘরের মাঝামাঝি এসে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। মস্ত মস্ত খোলা জানালায় সমস্তটা আকাশ এসে তার আলো নিয়ে লুটিয়ে পড়েছে লাল সিমেন্টের মেঝের উপরে। তার পায়ের পাতায় রোদের উত্তাপ আদরের মতো স্পর্শ করলো।

চোখ ফিরিয়ে সে দেখলো চারদিকে। আর সব কিছুর চেয়ে খাটের তোষক-জাজিম পাতা বিছানাটাই তাকে বিচলিত করলো বেশী। ধব ধব করছে চাদর, ধবধবে বালিশের ওয়ার পায়ের তলায় লেপের আরাম। একটি সুজনি দিয়ে ঢাকা। মহামায়া কি তাকে পরীক্ষা করছেন কোন রকম? একি সত্যি! সত্যি সে এই খাটে উঠে এই বিছানায় শোবে?

হঠাৎ তার নিজের বাপকে মনে পড়ে গেল। হেঁটো ধুতি আঁটো ক'রে পরা ধুলো কাদা মাখা মস্ত মস্ত দুই পা আর এক বুক ঘন লোমওলা বাবা। যে বাবা তার মায়ের মৃত্যুর পরে একদিনের জন্য তাকে একটা ভালো কথা বলেননি, মিষ্টি মুখে ডাকেননি, আদর করেননি। মায়ের মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যেই যে বাবা বিয়ে ক'রে এসে তাকে ভুলে গিয়েছিলেন। এ পক্ষের আধ ডজন ভাই বোনদের সারাদিন কোলে কাঁখে রাখতে রাখতে সৎমায়ের দাঁতখিঁচুনি শুনতে শুনতে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লে যে বাবা স্ত্রীর নালিশ শুনে চুলের মুঠি পাকিয়ে ধ'রে ঠেঙাতেন। যে বাপ তাকে টাকার লোভে এক চল্লিশ বছরের দুষ্টু লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। এই তো সেদিনও রাত্রির একা অন্ধকারে বাবা তাকে কেমন শেয়াল কুকুরের মতো দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন।

এই পরিপাটি সুদৃশ্য বিছানার সঙ্গে তার বাবার যে কী সম্বন্ধ

তা কুসুম বুঝলো না, তবু কী জানি কেন মনে পড়ে গিয়ে কেমন একটা কষ্ট হ'লো। তার জীবনে এই বাবাই হয়তো একটু মমতার জায়গা অধিকার ক'রে আছে, বাবা ছাড়া আর আপনজন কে আছে তার? বাপের বাড়ির মাটির ঘরের এক আঁধার কোণে শুয়ে থাকতো সে, এই রকম যখন শীত শীত হ'তো, মা কাঁথা দিতে চাইতো না, বাপ দিতো। আধো ঘুমে আধো জাগরণে বাপের সেই স্নেহটুকু সে কাঙালের মতো গ্রহণ ক'রে চাপা কান্নায় ডুকরে উঠতো। হয়তো ঐ এক ফোঁটা সুখস্মৃতির সঞ্চয়েই বাবাকে মনে পড়লো তার। বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ সেটুকুও দেয়নি।

আর স্বামীর বাড়ির বিছানা? বিভীষিকা। বিভীষিকা। সেই ময়লা তেল চিটচিটে বিছানা ভরা তার স্বামীর গায়ের গন্ধ, বিড়ির গন্ধ, তাড়ির গন্ধ। বমি আসতো কুসুমের। স্বামীর সঙ্গে শুতে হবে ভাবলে ত্রাসে বুক হিম হ'য়ে আসতো। সারাদিন কেবল খাটুনি আর খাটুনি। বকুনি আর বকুনি। অশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভাষার ঢল নামতো মা-ব্যাটার মুখ দিয়ে। আব রাত্রিবেলা আদর। মাটিতে আঁচল বিছিয়ে হাতে মাথা রেখে শুয়ে থাকতো কুসুম, তাড়ি খেয়ে অধিক রাত্রে মত্ত হাতির কামনা নিয়ে স্বামী তাকে বিছানায় তুলে নিতো। তার শক্ত শীতল শরীরটাকে নিয়ে যে কী করতো উন্মাদের মতো। তারপর ফেলে দিতো লাথি মেরে। মেঝের উপর মরা হ'য়ে পড়ে থাকতো কুসুম। তারপর আবার সকাল, আবার দুপুর, আবার বিকেল, আবার রাত্রি। আঠারো বছরের কুসুমের আঠারো বার ফাঁসি লাগিয়ে মরতে ইচ্ছে করেছে, গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে ঠাণ্ডা হ'তে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু মনের অতল থেকে এক বিদ্রোহ জেগে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। কেন। কেন। কেন মরবো, এদের জন্য মরবো কেন। এদের জন্য নিজেকে কেন মুছে দেবো জগৎ থেকে। তারপর অদ্ভুত এক জেদ নিয়ে দাঁতে দাঁত আটকে সে সব সহ্য করেছে। হাজারো কথার উত্তরে একটা কথা বলেনি, হাজারো

অত্যাচারের বিরুদ্ধে একবার প্রতিবাদ করেনি। লোকে ধন্য ধন্য করেছে, নাম পড়ে গেছে ভালো বলে। এমন ভালো স্ত্রী, তাই অন্য স্বামীরা তার স্বামীকে হিংসে করেছে, এমন ভালো বৌ, তাই অন্য শাশুড়িরা তার শাশুড়িকে হিংসে করেছে। আর শেষ পর্যন্ত একদিন তার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো, একদিন সে প্রতিবাদ জানালো। একদিন, একেবারে চরম ক'রে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু এতোটা সে চায়নি, এতোটা সে ভাবেনি।

ধীরে ধীরে বিছানার কাছে এগিয়ে এসে বুকটা যেন ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো কুসুমের। এই বিছানায় সে শোবে কী, ছুঁতেই যে সাহস হয় না। তবু একটু বসলো, বসেই উঠে দাঁড়ালো। সন্তর্পণে মহামায়ার ঘর আর তার ঘরের সামনেকার উড়ন্ত পর্দাটা দেখলো। মহামায়া বালিশে চুল ছড়িয়ে শুয়ে বই পড়ছেন একটা। আস্তে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো, একটু দাঁড়ালো, কী ভেবে নিঃশব্দে ছিটকিনিটা তুলে দিলো। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে সারা শরীরে গড়িয়ে পড়লো বিছানায়, মস্ত লম্বা চুলগুলো মহামায়ার মতো ক'রেই এলিয়ে দিলো। একটু পরেই উঠে বসলো আবার, আবার শুলো, আবার বসলো। বুঝতে পারলো না মহামায়া তাকে কোন স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছেন, কেন এমন লোভ দেখাচ্ছেন, শেষে কি সত্যি সে রমাদির মতো হ'য়ে যাবে? ভদ্রলোকের মেয়েদের মতো? সে ভদ্রলোক হবে? ভদ্রলোক।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে গিয়ে এবার দাঁড়ালো সে নিজেকে দেখতে, সুন্দর শাড়ি, সুন্দর ব্লাউস, সুন্দর লাগলো দেখতে। শাড়িটা ঘুরিয়ে পরতে চেষ্টা করলো, মাথার চুলগুলো কায়দা ক'রে আচড়াতে লাগলো। তেল সাবান কাঁটা ফিতে, পাউডার ক্রীম, মোটা বেঁটে ছোটো লম্বা কতো ধরনের কতো কিছুই সাজিয়ে রেখেছেন মহামায়া। আলনায় ভাঁজ করা শাড়ি ব্লাউস, শায়া, এমন কি এক

জোড়া লাল টুকটুকে স্যাণ্ডেল পর্যন্ত। দেখতে দেখতে সমস্ত জিনিসগুলো সে এলোমেলো ঘাঁটতে লাগলো দু'হাতে, আবার গুছোলো, আবার ঘাটলো, শেষে যেন মূর্ছা যাবার মতো দশা হ'লো তার। যেন বিশাল অরণ্যে পথ হারিয়ে দিশাহারা হয়েছে, এমন অসহায় ভঙ্গিতে বসে পড়লো মেঝের উপর।

॥ ১৩ ॥

চাকরী পাবার পরেই সোমেন মেস ছেড়ে আরো তিনজন বন্ধুর সঙ্গে একটি ছোটো দু'ঘরের ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে সংসার পেতেছিলো। মেসের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো এদের. সেই একঘেয়ে খাওয়া আর বারোয়ারী বনবাস যেন সহ্য হচ্ছিল না। ভেবেছিলো—ঠাকুর-চাকর রেখে স্বাধীনভাবে থেকে খেয়ে আরাম পাবে অনেকটা। কিন্তু কয়েক মাস যেতেই বুঝতে পারলো সে আশা মরীচিকা মাত্র। মেসে তবু নির্দিষ্ট পয়সা ফেলে দিলেই কেটে যেতো মাসটা, নিজস্ব সংসারে এসে দেখলো খাওয়া থাকার মাপটি মেসের তুল্য হ'লেও খরচের মাপের কোনো কাঠি নেই। এবং এ ভাবে চলতে থাকলে সর্বস্বান্ত হ'তেও আর বেশী দেরি থাকবে না।

অনেক খুঁজে পেতে অনেক ইনটারভিউ নিয়ে অত্যধিক মাইনেতে তারা যে রাঁধুনিটিকে সংগ্রহ করেছিলো, তাব তৈলচিক্কণ চেহারা অচিরেই আরো তেলালো হ'য়ে উঠলো বটে, কিন্তু সেই রান্না খেয়ে প্রভুদের চেহারায় খড়ি উঠে গেল। রাঁধুনিটি উৎকলবাসী। বটুয়া থেকে বারে বারে পান খেতে খেতে তার লাল দাঁত ক্ষয়ে গিয়েছিলো, সেই দাঁতে সর্বদাই সে হাসছে। বাবুরা যখন কাজে ভর্তি করবার সময় তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'রান্না জান তো?' হেসে মরে গিয়েছিলো সে এই অর্বাচীন প্রশ্ন শুনে, উত্তেজিত হ'য়ে জবাব দিয়েছিলো, 'মু রন্না জনে না!'

অপ্রস্তুত হ'য়ে বাবুরা বললেন, 'না না. জানো তো নিশ্চয়ই, মানে বেশ ভালো রান্না করতে পারো তো!'

রাঁধুনি সগর্বে জবাব দিলো, 'মু ন জনে তো কোঁই জনে। মু ইদিকও জনে, সিদিকও জনে। ইদিকে ডালো, মাছো, চরোচরি, আর সিদিকে চপো কটোলেটো, মাংসো নিকিরি আরো সব বিলাইতি রন্না—'

'থাক থাক আর বলতে হবে না, আমাদের এতেই চলবে। এমন কি এদিক সেদিন তু'দিক না জেনেও যদি এদিকে শুধুমাত্র সুস্বাদু ক'রে ডালটুকু মাছটুকু রেঁধে দাও তাই ঢের।'

বাবুরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ চার্ট করতে বসে গিয়েছিলো কোনদিন কী খাবে। ছুটির দিনে যে চপ কাটলেটও একেবারে খাবে না এমন কোন পণও করলো না তারা। বরং মনে মনে ভাবলো সেই মুহূর্তটাকেই যদি একটা ছুটির দিনে রূপান্তরিত করবার কোনো অলৌকিক মন্ত্র জানা থাকতো তা হ'লে কী ভালোই না হ'তো।

রাঁধুনি উদয় চন্দর বাবুদের আরো খুশি করলো। সে বললো সব কাজ সে একাই করবে। বাবুরা আর একটা ছোকরা চাকর রেখে মিছিমিছি তাকে একগাদা ভাত আর একরাশি মাইনে দেবেন কেন? কেন, তার 'হাতো রথো' কি জগন্নাথ দেবের মতো ঠুঁটো যে এই সামান্য কাজটুকুও সে একা পারবে না? তবে হ্যাঁ, শুধু বাসন মাজার জন্য একটা ঠিকে ঝি বন্দোবস্ত করতে হবে বটে। তা আর কতো। মাইনেও বেশী না, খাওয়া তো নেই-ই।

সেই ঝির জন্য বাবুদের কষ্ট ক'রে খুঁজতে দেয়নি সে, নিজেই জুটিয়ে নিয়ে এসেছিলো। এবং অল্পকালের মধ্যেই বোঝা গেল, প্রায় তিরিশ ছোঁয়া সুগঠিত সুন্দরী সাজুনি বাসন মাজুনির সঙ্গে তার সম্পর্কটা দিব্যি মধুর। এ বাড়ির কর্ত্তাইও হ্যাণ্ড শ্রীমান্ উদয়বাবুকে সে তার ঢলো ঢলো অঙ্গের লাবণীর অনেক কিছুই উপহার দেয়। তেরচা ক'রে তাকানো, গমক দিয়ে চলা, মান ক'রে বসে থাকা ইত্যাদি অনেক অপার্থিব সুখের দ্বারা সে তাকে উত্তেজিত ও তাড়িত করে।

"আর তার বিনিময়ে উদয়ের ক্ষয়ে যাওয়া লাল দাঁতের হাসিতে বা যখন তখন আঁচল টেনে ধরাটুকুতেই তার পোষায় না, ও সব ন্যাকামিতে বিশ্বাস নেই তার, তার চাহিদা সম্পূর্ণ জাগতিক। সুতরাং তাকে খুশি রাখবার জন্য উদয়কে যা দিতে হ'তো তার পরিমাণ বড়ো, সোজা ছিলো না। সেই মূল্য একার উপার্জনে কুলোলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি হ'য়ে সেখানে সে হাত দিতো না। বাবুদের পকেট ব্যবহারেই মর্জি ছিলো বেশী।

মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকে চিড় বিড় করতো বটে বিরক্ত হ'য়ে, কিন্তু বাসন মাজতে মাজতে কোমর বাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝি যখন একটি ভীম দৃষ্টি হেনে বলতো 'কী বললি', তৎক্ষণাৎ একেবারে ঠাণ্ডা। ভুরু মুহূর্তে টান টান, দাঁত বত্রিশটাই বেরিয়ে যেতো হাসিতে, আর তারপরে, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আদর ক'রে তেল সাবান ফিতে কাঁটা পাউডার পমেটম ইত্যাদি এতো বেশী ক'রে সরবরাহ করতে হ'তো বেচারাকে যে তাদের চার বন্ধুর এক মাসের জিনিস প্রথমে তিন সপ্তাহ যেতে লাগলো, তারপরে পনেরো দিন, শেষের দিকে লোভ বেড়ে বেড়ে এমন হ'লো নতুন জিনিসই উধাও হ'তে লাগলো। আর বাজার খরচ আরম্ভ হয়েছিলো পাঁচ টাকায়, আস্তে আস্তে দশ হ'লো, তারপর তেরো টাকায় উঠে ব্লাড প্রেসারের যন্ত্রের কাঁটার মতো থরথর করতে লাগলো আরো উপরে উঠবার জন্য। কিন্তু হিসেবে কোনো গোলোযোগ নেই, কোনো ফাঁক নেই যে ধরতে পারো। উৎকল-বাসিটির অঙ্কের মস্তিষ্ক প্রায় সত্যেন বসুর মতোই পরিষ্কার।

আর যে টাকায় যা এনে যা রান্না সে বাবুদের পাতের কাছে সযত্নে সাজিয়ে দিতো তার স্বাদ মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর হ'তো। খাদ্য-পানীয়ের সঙ্গে দাপিয়ে দাপিয়ে দৌড়ে এলো সব বেসিলাই, মুখের দরজা দিয়ে ঢুকলো গিয়ে পেটে, দেহে আর এক ফোঁটা চর্বি থাকতে দিলো না কারো।

অতএব অস্থিচর্মসার চার-পুরুষের সংসারের পাট চার দু'গুণে

আট মাস না পুরতেই শেষ। আবার গিয়ে গুটি গুটি সব হাজির হ'লো মেসের গহ্বরে। এর মধ্যে একজন বিয়ে ক'রে ফেললো হঠাৎ। এই ছেলেটি সোমেনের তু' বছরের সিনিয়র ছিলো, কিন্তু চাকরী করছিলো একই কলেজে, একই বিষয়ে। তুজনের বন্ধুতা অন্যদের তুলনায় গভীরতর ছিলো।

বৌ নিয়ে বাড়ি ভাড়া ক'রে সে সত্যিসত্যি আরামের সংসারে কায়েমী হলো। আর কায়েমী হ'য়ে সোমেনকেও নিয়ে এলো নিজেদের বাড়িতে। অসুবিধে নেই কিছু, বরং সুবিধেই। একখানা ঘর ছেড়ে দিলো তাকে, খাওয়া-দাওয়া একসঙ্গে। মেসে যা দিতো তাই দিয়েই সোমেন বন্ধুর স্ত্রীর সযত্নরক্ষিত গৃহে এসে বহাল হ'লো। তার এক মাসের মধ্যেই পুজোর ছুটি পড়ে গিয়েছিলো; বৌ নিয়ে, বোনকে নিয়ে পুরীতে সমুদ্র দেখতে যাবে স্থির করেছিলো বন্ধুটি, সোমেনকেও ছাড়লো না। বন্ধুর স্ত্রী বললো, 'এক যাত্রায় পৃথক ফল কি ভালো? চলুন, ঘুরে আসবেন।' সোমেন খুঁত খুঁত করেছিলো। তার পিছুটান আছে। মা প্রতীক্ষা ক'রে থাকবেন। সুতরাং দেশ ভ্রমণে বেরুতেও যতো মন টানছিলো, মা'র আকর্ষণও তার চেয়ে কম ছিলো না।

বন্ধু সমীর হালদার বললো, 'তাতে কী হয়েছে, মা খুশিই হবেন। যাচ্ছি তো সপ্তমী পুজোর দিন, আর ছুটি হচ্ছে মহালয়ার আগে। সে ক'টা দিন তুমি অনায়াসেই মা'র সঙ্গে কাটিয়ে আসতে পারো।'

এটা মন্দ প্রস্তাব নয়।

তা ছাড়া সমুদ্র দেখার লোভ কা'র না থাকে? সোমেনেরও ছিলো। হয়তো একটু বেশীই ছিলো।

সেই সাধ মিটলো তার। বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে ফিরে এলো সে। তার কল্পনার পরিধি যতোদূর যায় ততোদূরই সে ভেবেছিলো, কিন্তু সমুদ্রের পরিধি যে সেই কল্পনার চেয়ে কতো বড়ো সেটা না

দেখলে কোনোদিনই বুঝতে পারতো না। খুব আনন্দে কেটে গেল তিনটা সপ্তাহ।

আর ফিরে এসেও তার রেশ রইলো বেশ কিছুদিন। বন্ধুর স্ত্রীর সেবা-যত্নে সদালাপে দিনগুলো আর আগের মতো বিরস ছিলো না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, মা যাই বলুন, কয়েকটা ভালো টিউসনি যোগাড় করতে পারলেই মাকে নিয়ে আসবে সে কলকাতা। দেশের জাঁকজমক নাইবা থাকলো, নিবারণদা সঙ্গে আসবে, গরীব ভাবেই ছোটো বাড়িতে এক সঙ্গে সুখে কেটে যাবে দিন। এই কয় বছরের অভিজ্ঞতায় ভালো ক'রেই অনুভব করেছে, একজন মেয়ের সান্নিধ্য ব্যতিরেকে পুরুষের জীবন দুর্বিষহ। পুরুষ আরামপ্রিয় জাত, শারীরিক কষ্ট তাদের কাছে নরকের মতো অসহ্য, কোনো মেয়ের সেবা-যত্ন ভালোবাসা ছাড়া শৈশবের মতো চিরদিনই তারা অসহায়। মেয়েরাই তাদের পালয়িত্রী, ধাত্রী। বন্ধুপত্নীর সঙ্গলাভের পরে সে কথাটা সে আরো তীব্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করলো।

॥ ১৪ ॥

বন্ধুকে মনোবাসনাটা জানাতেই লাফিয়ে উঠলো সে, 'টিউসনি ? টিউসনি করবে ?'

'পেলেই করি।'

'আমার বোনকে পড়াও না।'

'তোমার বোনকে ?'

'শোনো, তুমি তো জানো আমার বাবা বর্ধমান থাকেন, সরকারী চাকরী করেন। আমরা পাঁচ ভাইবোন। বোন আমাদের এই একটিই। ফলত আদরে আদরে লেখাপড়াটা একেবারে পিছিয়ে গেছে। ধরেই নাও ফেল করবে, তবু এই পাঁচ মাস পড়িয়ে যদি থার্ড ডিভিসনেও আই. এ. টা পাশ করিয়ে দিতে পারো, বুঝবো তুমি সত্যি কৃতী পুরুষ। আমরা তিন ভাই-ই দাঁড়িয়ে গেছি বলতে গেলে, একটা মাত্র বোন, তার জন্য খরচ করতে আমরা পিছ-পা নই।

মাইনে যথাসাধ্য ভালোই দেবো, যদি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়াও।"

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।' সোমেন একবাক্যে রাজী। আর রাজী হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমীরের বোন শর্মিষ্ঠা হাজির হ'লো এসে বইপত্র নিয়ে।

কিন্তু দু'দিন নেড়েচেড়েই সোমেন বুঝতে পারলো মেয়েটি দেখতে মাঝারি হ'লেও বিদ্যায় চতুর্থ শ্রেণীর শেষ বেঞ্চির শেষ ছাত্র এবং এই অমনোযোগী অনিচ্ছুক তরুণীটিকে পাশ করানো শিবের অসাধ্য কর্ম। এই তিন সপ্তাহ একসঙ্গে পুরীতে থেকে আলাপ-পরিচয়ের প্রথম পর্বটা সমাধা হয়েছিলো, ছাত্রী হ'য়ে লক্ষ্মীর মতো পড়তে বসতেও কোনো সঙ্কোচ বা অনিচ্ছা দেখা গেল না তার, কিন্তু ঐ বসা পর্যন্তই।

তবুও হাল ছাড়লো না সোমেন। কৃতিত্বের অভিমানে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাবার জেদে মরণান্ত হ'লো। প্রথমে সে সোয়া শো টাকায় সপ্তাহে চারদিন পড়াবার চুক্তিতে কাজে লেগেছিলো, চারদিনের জায়গায় পাঁচ দিন করলো, ছ'দিন করলো, শেষ পর্যন্ত রোববারটা পর্যন্ত উৎসর্গ করলো ছাত্রীর কাছে।

মেয়েটি সমস্ত বিষয়েই এতো কাঁচা যে রাতারাতি তাকে পাস করানো বড়ো সহজ কর্ম, মনে হ'লো না! হ'তো যদি সে পড়তো। যতোটুকু সোমেনের কাছে ঐটুকুই, তার বাইরে সে পড়াশুনো নামক যন্ত্রণাকে আর এক মুহূর্তের জন্য প্রশ্রয় দিতো না।

বড়ো বড়ো চোখ, খাটো খাটো চুল, মুখের ভাবটি দুষ্টু, স্বভাবে অলস আর পড়াতে ঘোরতর অনিচ্ছা এই ক'টিই হ'লো তার প্রধান গুণ। শেষ পর্যন্ত হতাশ হ'লো সোমেন। পড়ানো ব্যাপারটা যে তার নেহাৎই পণ্ডশ্রম এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না। তা ছাড়া যেখানে সে খুব ভালো ভাবে জানছে যে এই মানুষকে পাস করানো একান্ত অসম্ভব, সেখানে এই মধ্যবিত্ত মানুষদের কাছ থেকে এতোগুলো টাকা হাত পেতে নিতে তার বিবেকে দংশন হচ্ছিলো। একদিন সে সমীরকে বললো সে কথা। সব শুনে সমীর মাথা চুলকোলো, চুপ

ক'রে রইলো, তারপর বললো, 'আর একটা মাস দেখো। তারপরেও যদি তুমি কোনো আশা দেখতে না পাও ছেড়ে দিও।'

মুস্কিল হচ্ছিলো, এক বাড়িতে থাকা নিয়ে। কোনো রকম অছিলা দিয়ে যে কেটে পড়বে তার উপায় ছিলো না। এ কথা বলার পরের দিন পড়াতে বসে হঠাৎ লক্ষ্য করলো, শর্মিষ্ঠা পড়ছে না, কিছুই শুনছে না। বিরক্ত হ'য়ে সোমেন বললো, 'আপনি যদি বসে বসে অন্য কথাই ভাবেন, তাহ'লে আমি আর পরিশ্রম করছি কেন?'

শর্মিষ্ঠা বললো, 'আমি বর্ধমান যাবো।'

'কবে?'

'কাল।'

'কেন?'

'কেন আবার, আমি তো সেখানেই থাকি।'

'কিন্তু এখন তো পরীক্ষা।'

'তাতে কী?'

'এমনিতেই তৈরী হয়নি, বর্ধমান গিয়ে কামাই করলে তো আরো পিছিয়ে যাবে সব।'

'আর তারপর ফেল করবো, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনি তো জানেন, বর্ধমান না গেলেও আমি পাস করতে পারবো না।'

'কে বলেছে?'

'আপনার চেয়ে সে কথা আর কে বেশী ভালো জানে?'

'চার মাস আগে একথা কেউ-ই জোর ক রে বলতে পারে না।'

'আপনিও পারেন না?'

'আমিও পারি না।'

'তবে দাদাকে বলেছেন কেন? আর 'বিবেক দংশনটাই বা কিসের?'

চোখ তুলে তাকালো সোমেন, একটু হেসে বললো, 'বুঝেছি।'

শর্মিষ্ঠা গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'কিন্তু সে কথাটা দাদাকে না জানিয়ে আমাকে জানালেই কি ভালো ছিলো না?'

'কী লাভ হ তো?'

'যদি কোনো লাভের কথা ভেবেই বলে থাকেন, তাহ'লে দাদাকে বললেই বা কী লাভ হ'লো? পরীক্ষা তো আর দাদা দিচ্ছেন না, মাষ্টারটিও দাদার নয়। ওটা সর্বতোভাবেই আপনার আর আমার ব্যাপার।'

'টাকাটা তো ওঁরাই দিচ্ছেন।'

'তাহ'লে টাকাটাই আসল পয়েন্ট।'

'কম কী।'

'তবে গরীবের উপকার করুন না, টাকা ছাড়াই পড়ান না।'

'যদি জানতাম তাতে কোনো উপকার হবে তাহ'লে তাই করতাম।'

'উপকার বলতে কী বুঝছেন?'

'আপনার পাস করা, পড়ায় মনোযোগী হওয়া।'

'মনোযোগী হ'লেই কি পাশ করতে পারবো?'

'কেন পারবেন না?'

'তাহ'লে আর কী, বর্ধমানই যাই আর এখানেই থাকি মন দিয়ে পড়া করাটাই আসল, সেখানে গিয়েই করবো।'

'সাহায্যেরও দরকার।'

'আপনি ছাড়া কি সাহায্যের আর কোনো লোক নেই?'

'থাকলে ভালো।'

'তবে সে হয়তো এতো বিবেকবান পুরুষ হবে না যে চারদিনের চুক্তিতে সাতদিন পড়াবে, অথবা ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিবেকের কামড়ে জর্জরিত হ'য়ে কাজ ছেড়ে দেবে।'

সোমেন চুপ ক'রে রইলো।

উত্তেজিত হ য়ে শর্মিষ্ঠা বললো, 'জবাব দিচ্ছেন না কেন?'

'কী জবাব দেবো?'

'এই অপমানটা আপনি আমাকে করলেন কেন?'

'অপমান করিনি।'

'হ্যাঁ করেছেন।'

'ঝগড়া না ক'রে বই খুলুন।'

'খুলবো না, পড়বো না, পরীক্ষা দেবো না।'

'বেশ।'

'খুব মজা, না?'

'মজা আর কী।'

'কিন্তু না, আমি পড়বো, আপনার কাছেই পড়বো এবং পরীক্ষা দিয়ে ফেল ক'রে আপনাকে অপদার্থ প্রমাণ করবো।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো সোমেন, 'আজকে আপনার ছুটি, যান বৌদির সঙ্গে গল্প ক'রে মাথা ঠাণ্ডা করুন গিয়ে। কিন্তু কাল থেকে যদি মন দিয়ে না পড়েন মাষ্টার হিসেবে আমার যথাকর্তব্য আমি পালন করবো।'

'কী করবেন? মারবেন?'

'সেই বোঝাপড়াটা তখুনি হবে।'

'না, সেটা আমি এখুনি ক'রে ফেলতে চাই।'

সোমেন বসলো। বললো, 'তবে তাই করুন। বই খুলুন।'

তৎক্ষণাৎ বই খুললো শর্মিষ্ঠা, পড়লো, প্রমাণ করলো সে গাধা নয়।

আসলে লেখাপড়ার প্রতি শর্মিষ্ঠার যতো অমনোযোগই থাকুক না কেন, একমাস ছাত্রীত্ব করার পরেই মাষ্টারের প্রতি মনোযোগী হ'য়ে পড়েছে সে দ্বিগুণ। এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই কাজে লাগলো। লেখাপড়ায় খারাপ বলে মাষ্টার পর্যন্ত পড়াতে চাইছে না, আর সেই মাষ্টার, যাকে একবেলা না দেখলে তার দিনটা ব্যর্থ বলে মনে হ'তে আরম্ভ করেছে, এটা তার সইলো না। সে আহত হ'লো, অপমানিত হ'লো, এবং সেই ধাক্কায় তার জেদ চেপে গেল। পড়াশুনোয় সে

অখণ্ড মনোনিবেশ করলো, সোমেনও খাটতে গররাজি হ'লো না, আর তার জন্য বড়োদিনের ছুটিতে দেশে গেল না সে।

॥ ১৫ ॥

বলাই বাহুল্য, তাতে দুঃখিত হ'য়েছিলেন মহামায়া। রাগ ক'রে লিখেছিলেন, 'বুঝতে পারছি সহরে থেকে এখন আর তোমার গ্রামে আসতে ইচ্ছে করে না, এলেও মন টেঁকে না। কিন্তু আমার কথাটাও তো একবার ভাবতে পারতে? আমি যে সমস্তটা বছর এই ছুটিগুলোর দিকেই তাকিয়ে বসে থাকি তা তোমার অজানা নয়।'

সোমেন তৎক্ষণাৎ জবাব লিখলো, 'তুমিও তো জানো মা, আমার সমস্ত কাজই তোমাকে ভেবে। এই কাজটাও যে তার ব্যতিক্রম নয় তা কি নতুন করে বুঝিয়ে বলতে হবে? আজকাল আগের মতো বারো দিনে বড়দিন নেই, মাত্র চারদিনের ছুটি। ভজঘট ক'রে গিয়েই নাকেমুখে দৌড়ে এলে তোমারি কি ভালো লাগতো? তোমাকে আগেও লিখেছি সমীরের বোনটি এমনি বেশ চালাক চতুর, বুদ্ধিমতী, কিন্তু লেখাপড়ায় যা তা। পণ করেছি পাস করাবো। ইদানিং তার নিজেরও গরজ হয়েছে, তাই আর যাবার চেষ্টা করলাম না। পুরো পাঁচ মাসের টিউসনি। ছাত্রীটির পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত বন্দী আছি বটে, কিন্তু তারপরেই পরীক্ষার লম্বা ছুটি এবং লম্বা টাকা। আমি নিশ্চয়ই এবার তোমাকে নিয়ে আসবো, তুমিও এবার তোমার গ্রামের মায়া কাটিয়ে ঘর সংসার মন সব আসবার জন্য প্রস্তুত করে রেখো। আক্ষরিক ভাবে জেনো এই পরিশ্রম আমার তোমাকে নিয়ে আসার জন্যই। এই টিউসনির টাকা থেকে আমি একটি পয়সাও খরচ করি না। ভেবে দেখেছি পাঁচ মাসে আমার হাতে যখন পুরো ছ'শো পঁচিশ টাকা হবে, তাতে তোমাকে নিয়ে এসে নতুন সংসার পাততে আমার কোনোই অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া সমীর বলছে তুমি এলে আমরা এক সঙ্গে আর একটা বড়ো বাড়ি নেবো, ওরা কাছে থাকলে

তোমার একটুও খালি লাগবে না, আমিও নিশ্চিন্ত হবো।'

কয়েকদিনের মধ্যেই তার মস্ত এক লম্বা জবাব লিখলেন তার মা। সোমেন,

তোমার চিঠি পড়ে সব জানলাম। একটি খবর দেবো দেবো ক'রেও তোমাকে এ পর্যন্ত দেয়া হ'য়ে ওঠেনি। তোমার চিঠি পাবার পরে মনে হ'লো সেটা এখনই জানানো উচিত। ভেবেছিলাম পৌষের ছুটিতে এলে সাক্ষাৎ মতো কথাবার্তা হবে, কিন্তু আসতে যখন আরো অনেক দেরি আছে সুতরাং চিঠিতেই লিখি।

পুজোর সময়ে, ঠিক যেদিন তুমি গেলে সেই সকাল থেকে একটি মেয়ে তার স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয়ে ওঠে। মেয়েটি এক কথায় অত্যন্ত সুন্দরী, বয়েস আঠারো উনিশের বেশী মনে হয় না, স্বভাবটি অতিশয় ধীর এবং মন পরিচ্ছন্ন। একেবারেই শিশুর মতো হৃদয়। শ্বশুরবাড়িতে সবাই মিলেই মার-ধোর করতো, সৎমায়ের নির্যাতনে বাপের ঘরেও জায়গা ছিলো না, তাই একদিন অসহ্য হ'য়ে বেরিয়ে এসেছে।

আমার সঙ্গে তুমি এ বিষয়ে একমত হবে যে একজন মানুষের জীবন কিছু ফেলে দেবার নয়। আমি প্রথমটায় একটু দ্বিধান্বিত ছিলাম বটে, কিন্তু এখন তাকে একজন সংসারের অঙ্গ বলেই মেনে নিয়েছি। নিজের মেয়ের চেয়ে তাকে আমি কোনো অংশে কম দেখি না। ও যাতে মানুষ হ'য়ে ওঠে, মানুষের মতোই বাঁচতে শেখে, অন্তত সে শিক্ষাটুকু আমি ওকে দিয়ে দিতে চাই। ও যেন নিজেকে মমতা করে। যেন জানে যে এই জগৎ সংসারে তাকেও ঈশ্বর বেঁচে থাকার যোগ্য একটি প্রাণ দিয়েই পাঠিয়েছেন। আমার তোমার মতো তারও মনুষ্য সমাজে কিছু মর্যাদা পাওনা আছে, আত্মসম্মানের দায় আছে। ভেবেছিলাম দেশটা বুঝি কিছু অগ্রসর হয়েছে, হয়তো সমাজের অন্ধকারতম কোণেও কিছুটা শিক্ষার আলোকপাত হয়েছে। মেয়েরা হয়তো আর আগের মতো ততোটা অসহায় নেই। কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখে নিম্নশ্রেণীর সমাজটা যে কী ভীষণ তা

উপলব্ধি ক'রে মনে হচ্ছে, এদের পুরুষরা এখনো আদিম মানবের মতোই ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত নির্বোধ। স্ত্রীলোক এদের ভোগের সামগ্রী। কুকুর বেড়ালের চেয়েও অন্ত্যজ। ঘরে ঘরেই তাদের এই আঁধার। এই ভাবেই এই সব সমাজের স্ত্রীলোকেরা পুরুষশাসিত হ'য়ে ক্রীতদাসীর মতো জীবনধারণ করে। আর এই লাথি খেয়ে দাসীবৃত্তি করতে করতে এরাই যখন আবার কারো শাশুড়ি হয়, ননদ হয়, নিজের যন্ত্রণার সমস্ত সঞ্চিত প্রতিশোধ তখন বাড়ির বৌটির উপরই নিতে বদ্ধপরিকর হয়।

জানি না আবার কবে আর একজন বিদ্যাসাগর জন্ম নেবেন, এদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়ে দিয়ে এই চেতনায় পৌঁছে দেবেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তারা ভাবতে শিখবে তারাও মানুষ, শুয়োরের মতো এক পেট খেয়ে নোংরায় মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে থাকাটাই বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

সব মেয়ের সব বেদনা দূর করা আমার করায়ত্ব নয়, কিন্তু এই মেয়েটি যখন আমার আশ্রয়ে এসে উঠেছে, মা বলে ডেকেছে, নিজেকে সমর্পণ ক'রে বাঘের ভয়ে ভীত হরিণের মতো চকিত হ'য়ে আছে, তখন এর সব ভারই আমি নেবো। আমি ওকে শিক্ষায় সহবতে একজন যোগ্য মানুষ ক রে তুলতে চেষ্টা করবো। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, তার ঘুমন্ত মনকে নাড়িয়ে জাগিয়ে তোলা খুব কঠিন কাজ বলে মনে হচ্ছে না। এই উন্মুখ সজল মাটিতে বীজ ছড়াতে ভালো লাগছে আমার, অঙ্কুরের উদ্গমও দেখতে পাচ্ছি। জানি একদিন এই গাছ ফুলে ফলে ছায়ায় স্নিগ্ধতায় ভ'রে গিয়ে আমাদের সুখী করবে, সফল করবে।

এই প্রসঙ্গে আরো একজনকে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, একাদিক্রমে বহুবছর যে আমার হৃদয়ের অতি গভীরে লুকিয়েছিলো, যাকে আমি সচেতনভাবে বহুবছর মনে করিনি। সে যখন মারা গিয়েছিলো, তার দশ বছর বয়স ছিলো ; এখন ভাবলে আর কিছুই মনে পড়ে না, শুধু সেই দশ বছরের কচি লালিত্যটুকুই আটকে আছে স্মৃতিতে। তুমি তখন অবোধ শিশু, সে তোমার সাত বছরের বড়ো দিদি ছিলো। এই মেয়েটির সঙ্গে কী জানি কেমন ক'রে তাকে আমি গুলিয়ে ফেলি ;

কেবলি মনে হয়, সে-ই বুঝি এই নতুন ছলে আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে মা ডাকবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার অন্য সব পরিচয় ভুলে যাই, এবং ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত দায়িত্ব অনুভব করি।

কিছুকাল আগেও আমার এই অত্যধিক মনোযোগ তার কাছে একটু সন্দেহের কারণ ছিলো, চারদিকে সে সংশয়ী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করতো, এ আবার কোন নতুন ফাঁদে পা দিলো। মেয়েটা এতো দুঃখী, জীবনের কাছ থেকে এতো কম পেয়েছে যে কোনো আনন্দকে, সুখকে সে ভয়ের চোখে না দেখে পারে না। এখন সেই ভয় ভেঙে সে সহজ হ'য়ে উঠেছে, এই বাড়ির একটি স্বাধীন সত্তা হ'য়ে উঠেছে। তুমি মনে মনে জেনো সে তোমার বোন। তার জন্য যেন তোমার মনেও একটু জায়গা থাকে।'

ভালো ক'রে চিঠিটা পড়ে রাগ হ'লো সোমেনের। মাঝে মাঝে কেন যে মা এ সব জঞ্জাল এনে জোটান ভেবে পেলো না। সেই একটা ছেলেকে রাখলেন ক'দিন, শেষে চুরি ক'রে পালালো, আবার এই। কোথায় সে আরো ভাবছে বাড়ি ভাড়া ক'রে নিয়ে আসবে মাকে, আর সেই কথা ভেবে প্রাণপণে এই টিউসনির টাকাটা আগলে আগলে বেড়াচ্ছে, তার উপর এ এক কী শনিগ্রহ জুটলো। যা দেখা যাচ্ছে, কলকাতা এলে এ-ও আসবে সঙ্গে। সামান্য এক বেসরকারী কলেজের লেকচারার সে, মাইনে তো দু'শো তিরিশ, আর সামান্য কিছু দেশের জমি জায়গা থেকে হয়তো কুড়িয়ে কাচিয়ে জুটবে, এইটুকু আয় সম্বল ক'রে আরো একজনকে প্রতিপালন কি সহজ নাকি? তাছাড়া তার জায়গা লাগবে না? তারা মা আর ছেলে, একটি দু'ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাটেই চলে যেতো, এই একটা অপরিচিত মেয়ে নিয়ে কোথায় ঠাসাঠাসি গুঁতোগুঁতি করবে? মায়ের উপর সে বিরক্ত না হ'য়ে পারলো না। হয়তো নিজের ছেলের দিকটা তিনি যেন কখনোই ভাবছেন না। হয়তো এখন এই ছুতো ধ'রে দেশেই পড়ে থাকবেন।

ঠিক আছে।

আলো না জ্বালিয়ে অন্ধকারে বসে রইলো সে গুম হ'য়ে।

রাত্রিবেলা খেতে বসে একটি সুসংবাদ পরিবেশন করলো সমীর হালদার। কোথায় বাড়ি দেখে এসেছে সে, খোলামেলা সুন্দর বড়ো বড়ো ঘর, অথচ সেই অনুপাতে ভাড়া সস্তা। সোমেন রাজী থাকে তো নিয়ে নিতে পারে। সোমেন আর সোমেনের মা। সে আর তার স্ত্রী। এই তো মাত্র চারটি প্রাণী, ভাগাভাগি ক'রে চমৎকার কুলিয়ে যাবে। আস্ত একতলা, জমি আছে একটু—

শুনতে না শুনতেই নেচে উঠলো সমীরের স্ত্রী কৃষ্ণা, খুব ভালো হবে, উঃ বাবা, এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাত পা ছড়াতে পারলে বাঁচি। ক'টা ঘব বলো তো?'

উৎসাহিত হ'য়ে সমীর বললো, 'সে সব ঠিক আছে, চারজন মানুষ সত্যিই হাত পা ছড়াতে পারবো, কিন্তু ভাড়া গুণতে পারবো কিনা সেটাই আসল কথা।'

'এই যে বললে সস্তা।'

'বাড়ি অনুপাতে সস্তা কিন্তু আমাদের অনুপাতে—'

শর্মিষ্ঠা ভুরু কুঁচকালো, 'আমার কথাটা ভাবছো কী?'

'তোর আবার কী কথা?'

'আমিও তো থাকবো। বি. এ.তে ভর্তি হবো না?'

'ওরে বাবা, এ যে দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম, আই. এ. পাস করাতেই গলদঘর্ম, আবার বি. এ?'

'নিশ্চয়ই।' তা তোমার কি ধারণা আমি আই. এ পাস করবো না? আপনি কী বলেন?' শর্মিষ্ঠা সোমেনের মুখের দিকে তাকালো। গোমরা মুখে একটু হাসলো সোমেন।

সমীর বললো, 'আজ তোমার কী হয়েছে বলো তো? যেন কিসের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ ঘোষণা ক'রে বসে আছ।'

'ঠিকই ধরেছ।'

'কী ব্যাপার ?'

'কিছু বলার মতো নয়।'

'তবু শুনি।'

'মাকে লিখবার জন্য একটা পত্র রচনা করছি মনে মনে।'

'মার অপরাধ ?'

'তাঁর কলকাতা আসবার মতলব নেই।'

'লিখেছেন নাকি ?'

'স্পষ্ট না লিখলেও দাঁড়াচ্ছে গিয়ে তাই।'

'যথা।'

'বিশদভাবে শুনে আর কী করবে।'

'বাড়িটা নেবো কি নেবো না তাই স্থির করবো।'

'নিলে কবে থেকে নিতে চাও ?'

'যে ভদ্রলোক আছেন, তিনি আরো মাসখানেক আছেন, তার মানে মার্চ থেকে—'

'সময় আছে।'

'হ্যাঁ, তা আছে।'

'এর মধ্যে বাড়িতে একবার ঘুরে আসতে হবে—'

'আর আমার পরীক্ষা ?' বলেই অস্থির হ'য়ে এক চোখ তুলে শর্মিষ্ঠা তির্যক দৃষ্টি হানলো সোমেনের দিকে।

সোমেন বললো, 'তাতে কী ?'

'তাতে কী ? তাতে অনেক কিছু। আমার পরীক্ষার আগে কিছুতেই আপনার কোথাও যাওয়া হবে না।'

সোমেন হাসলো, 'তার আগে ছুটিও নেই কলেজে। আপনারা পরীক্ষায় বসলে তবে তো অবসর ?'

কৃষ্ণাও হাসলো, 'তার চেয়ে তোমার হয়ে সোমেনবাবু গিয়েই শাড়ি পরে পরীক্ষাটা দিয়ে আসুন।'

'আঃ তা হ'লে যা হ'তো।' শর্মিষ্ঠা জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করলো।

হঠাৎ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়ে সোমেন বলে উঠলো, 'হ্যাঁ

সমীর, বাড়ি তুমি ঠিক ক'রে ফেলো, পরীক্ষার সময়ে কলেজে কয়েকদিন ছুটি আছে, যদি যেতে পারি সেই সময়ে গিয়ে আমি জোর ক'রেই মাকে নিয়ে আসবো।'

'চমৎকার। লাভলি। যা সুন্দর বাড়ি, দেখলে মোহিত হ'য়ে যাবে।' লাফিয়ে উঠলো সমীর।

খুশিমনে খাওয়া শেষ হ'লো সকলের।

॥ ১৬ ॥

দেখতে দেখতে কেটে গেল ছ'টা মাস। বসন্ত এলো, শীতের শুকনো ডালে নতুন পাতার উদগম হ'লো, ধুলোমাটি আবর্জনা সব উড়িয়ে নিয়ে গেল চৈত্র মাসের উতল হাওয়া। আর সেই অবকাশে কুসুমের দেহমন থেকেও তার পুরোনো খোলস ঝ'রে পড়লো। নতুন জীবনের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সে থমকালো। ততোদিনে ভয়ের ছায়া সরে গিয়ে বিশ্বাস দেখা দিয়েছে চোখের দৃষ্টিতে, ধুপছায়া গ্রামের দুঃস্বপ্ন ধূ ধূ হ'য়ে এসেছে, গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে আলোর বিন্দু দেখে তাকিয়েছে সেদিকে। এই মাটির জগৎটাকে আর ততো খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। অনুভব করছে এই আলো-আঁধারে ঘেরা দিন আর রাত্রির মধ্যে সে-ও একটা প্রাণ। সে আছে, বেঁচে আছে, বেঁচে থাকায় আনন্দও আছে।

মহামায়া যত্ন ক'রে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন তাকে, সে-ও শিখছে। গল্প উপন্যাস শুনতে শুনতে নেশা ধরেছে। শুনে শুনে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছে সে, অকাতরে বলে দিতে পারে কোন উপন্যাস কার লেখা, নিঃসংশয়ে বলে ফেলে কোন লেখাটা ভালো আর কোন লেখাটা মন্দ। কোন চরিত্রের উপর তার সহানুভূতি আছে বা নেই। তার মতামত তার নিজস্ব। সেখানে যুক্তি-তর্কের কোনো প্রশ্ন নেই, দায়িত্ব বোধের বালাই নেই, সুতরাং অসুবিধেও নেই কোনো। নিজের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার উপরেই তার

বিচারের মাপকাঠি।

মহামায়া তাকে ইতিহাস ভূগোলও শিখিয়েছেন। সে জেনেছে তার দেশের নাম ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষে ছত্রিশ জাতির বাস, তাদের ছত্রিশ রকমের ভাষা। তার নিজের দেশের নাম বাঙলা দেশ, তার ভাষার নাম বাংলা, সে বাঙালী। রবীন্দ্রনাথ যে এই বাংলা ভাষাতে বই লিখেই পৃথিবী-বিখ্যাত হয়েছেন তা-ও সে জানে। আর এ-ও জানে এই পৃথিবীটা শুধুমাত্র তার ধুপছায়া গ্রাম বা এই কাঞ্চনপুরেই সীমাবদ্ধ নয়, আরো অনেক, অনেক বড়ো। তার চেহারা গোল, আর একটু চাপা ; এর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। সে জেনেছে, তারা—মানে ভারতবাসীরা এতোদিন পরাধীন ছিলো, এখন স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন ভারতের রাজা জওহরলাল নেহেরু।

কিন্তু আসল নেশা তার গল্প উপন্যাসেই সীমাবদ্ধ। লাইব্রেরী থেকে বই আনাবার গরজ এখন তার মহামায়ার গরজকেও ছাপিয়ে গেছে। আগে যখন ধ'রে বেঁধে পড়ে শোনাতেন তিনি, তার হাই উঠতো। ঘটনাপ্রবাহের অচেনা জগতে, শালীন ভাষার কঠিন আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে কিছুই বুঝতে পারতো না সে, উসখুস করতো উঠে যাবার জন্য। বসে থাকতো শুধু মহামায়ার ভয়ে, ঘুমে ঢুলে পড়তে পড়তেও বলতো, 'হ্যাঁ শুনছি।' আস্তে আস্তে কবে যে কেমন ক'রে সে বুঝে ফেললো সব, কবে যে তার অনুভূতি প্রখর থেকে প্রখরতর হ'য়ে উঠলো, বোধ কাজ করতে লাগলো মাথার মধ্যে, তা সে বুঝতে পারলো না। একদিন মনে হ'লো মানুষগুলো যেন বইয়ের পাতা থেকে ঝাপসা ঝাপসা হ'য়ে ধরা দিতে এগিয়ে আসছে কাছে, স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে ক্রমে। তাদের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা সব যেন তার বুকের মধ্যেও আলোড়ন তুলছে।

অবহিত হ'লো সে। নতুন জগৎ দেখতে পেলো। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হ'লো। পাঁচমাসে সে প্রায় পঞ্চাশখানা বই কানে শুনলো, চোখে দেখলো। নেশায় নেশায় পড়তে শিখে ফেললো একদিন।

বললো, 'জানো মা, আমি যখন ছোটো ছিলাম আমার মা আমাকে একটা পাঠশালায় ভর্তি ক'রে দিয়েছিলেন। গাঁয়ের পণ্ডিত মশায় তিনি, গাছতলায় মাদুর পেতে বসে পাড়ার সব ছেলেদের পড়াতেন। বাবা দিতে চাননি, কিন্তু মা বললেন, 'হ'লোই বা মেয়ে, তা বলে একটু পড়তে লিখতে শিখলে দোষ কী ?' বাবা বললেন, 'বিধবা হবে যে। মেয়েরা বই ছুঁলেই বিধবা হয়।' মা কিন্তু সে কথা শুনলেন না। এক টাকা মাস-মাইনে দিয়ে ভর্তি ক'রে দিলেন। আমার তখন খুব গরজ ছিলো। বেশ ভালো লাগতো। অল্পদিনের মধ্যেই অক্ষর চিনে ফেললুম, লিখতে শিখলুম, আর তাই দেখে পণ্ডিত মশাই খুব খুশি। ভালোবাসতেন তিনি ; বললেন, 'জানো তো লেখাপড়া শেখে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে। যতো বেশী শিখবে ততো বেশী গাড়ি চড়বে।' পণ্ডিত মশায়ের বড়ো বড়ো চুল ছিলো, মস্ত মস্ত দাড়ি ছিলো, এতোবড়ো ভুঁড়ি ছিলো। সবাই ডাকতো নারদ মুনি। আমি ডাকতাম নারদ দাদু।

'নারদ দাদুর কথা শুনে আশা হ'লো মনে। গাড়ি চড়বার জন্য দিনে রাত্রে উৎসাহে মাথা গুঁজে থাকতাম। তারপর অনেক দিন হ'য়ে গেল, কোনোদিন গাড়ি চড়তে পারলাম না, তখন রেগে গিয়ে ফাঁকি দিতে লাগলাম। পাঠশালার নামেই পালাতুম। বইটই ছিঁড়ে গেল, বাবা একদিন আচ্ছা ক'রে ঠেঙিয়ে নাম কাটিয়ে দিলেন। আর তারপর আমার মা'র অসুখ করলো, ছ'মাস ভুগে মারা গেলেন, আমারও সব চুকে গেল।'

চুপ ক'রে থেকে মহামায়া বললেন, 'আর তারপর একদিন দেখলি পড়ায় ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজেই ফাঁকে পড়ে গিয়েছিস, না ?'

'তোমার কাছে এসে তাই মনে হচ্ছে।'

'তবু তো কই ফাঁকি দেবার ইচ্ছেটা যায়নি তোর। পড়তে শিখে সারাদিন গল্পের বই পড়িস, কিন্তু লিখতেও তো শিখতে হবে ?'

'তাই তো।'

'লিখতে যদি জানতিস তাহ'লে কলকাতায় দাদাবাবুকে কেমন চিঠি

লিখতে পারতিস। আসবার আগেই, দেখবার আগেই ভাব হ'য়ে থাকতো। আমাকে আর পরিচয় করিয়ে দিতে হ'তো না।'

কুসুম বললো, 'আমার কথা তুমি লিখেছ তো দাদাবাবুকে?'

'লিখেছি বৈ কি।'

'কী জবাব দিয়েছেন?'

একটু আনমনা হলেন মহামায়া। মনে পড়লো সেই যে বিস্তারিত ভাবে মস্ত চিঠিটা তিনি লিখলেন, তার জবাবে তো কুসুমের বিষয়ে কিছু লিখলো না সোমেন। সে কি তবে পায়নি চিটিটা। তা নইলে তারপরে আরো কতো চিঠি এলো গেল, কুসুমের বিষয়ে তো কখনো কোনো উল্লেখ দেখলেন না? তারপরেও তো মহামায়া অনেকবার কুসুমের কথা লিখেছেন, তারও কখনো কোনো উত্তর দেয়নি সে।

মহামায়ার ভাববার সময়টুকুর মধ্যে অন্য প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হ'লো কুসুম। প্রসঙ্গের অভাব নেই তার। সারাদিন পাখির মতো তার কিচির মিচির, 'আচ্ছা মা, তোমার মেয়ে নেই?'

'থাকলে কি—' বলতে গিয়ে থেমে গেলেন, কথা ফিরিয়ে বললেন, 'আছে বৈ কি।'

'আছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'কোথায়, তাঁকে তো কখনো দেখলাম না।'

'দেখিসনি?'

'দাদাবাবু দিদিমণি কাউকেই এতোদিনেও দেখলাম না।'

'দেখবি।'

'দাদাবাবু তো কলকাতা, দিদিমণিও কি কলকাতাতেই থাকেন?'

'না।'

'বিয়ে হ'য়ে গেছে? শ্বশুরবাড়িতে?'

'না।'

'তবে ?'

'তোর তো জানা উচিত।'

'কী ক'রে জানবো, তুমি কি কখনো তাঁর কথা বলেছ আমাকে ?'

'বলিনি ?'

'সব সময়েই কেবল দাদাবাবুর কথা বলো। সারাদিন শুনতে শুনতে আমি না দেখেও চিনে ফেলেছি। তোমরা সবাই তাই, নিবারণদা, ছোট্টু সিং সব একরকম। এ বাড়ির যা তুই চোখে দেখি সবই দাদাবাবুর। এটা তার খাট, ওটা তার বিছান', সেটা তার আলমারী—কিন্তু কই একদিনও তো দিদিমণির কথা বলোনি আমাকে। আসলে মেয়ের চেয়ে ছেলেকেই তুমি ভালোবাসো বেশী।'

'তাতে কি তোর হিংসে হয় ?' মহামায়া হাসলেন।

কুসুম বললো. 'আমার না হোক দিদিমণির তো হ'তে পারে ?'

'তোর না হ'লে তার হবে কেন ?'

'বা রে, আমি আর দিদিমণি এক রকম নাকি ?'

'দুই রকম কিসে ?'

গালে টোল ফেলে হাসলো কুসুম. 'তাই যদি বলো, আমি দিদিমণি হ'লে একটু মুস্কিল হ'তো তোমার।'

'কেন ?'

'কেন নয় ? মা তো দু'জনেরই এক, তবে একজনকে কেন বেশী ভালোবাসবে ?'

'তোকে তো আমি খুব ভালোবাসি, তা বলে কি তোর দাদাবাবু রাগ করবে কোনোদিন ?'

'দাদাবাবুর চেয়ে বেশী তুমি কাউকেই ভালোবাসো না।'

'তাই বুঝি ?'

'আর সে কথা দাদাবাবুও জানেন।'

'আর দিদিমণি ?'

'তিনি জানেন বলেই চিঠিও লেখেন না, আসেনও না।

'সে আবার আসবে কী? কাছেই তো থাকে।'

'কাছে?'

'জানিস না?'

'না তো।'

'এটা তবে কে?' কুসুমের মাথা নেড়ে দিলেন মহামায়া।

কুসুম লজ্জা পেয়ে লাল।

একটু পরে বললো, 'তোমার মেয়ে হবো, এত ভাগ্য কি আমার আছে?'

'আমার মেয়ে হওয়া খুব ভাগ্য নাকি?'

'নিশ্চয়ই!'

'তা হ'লে আর দুঃখ কী। মেয়ে তো হয়েইছিস্।'

'তা হয় না।'

'হয় না?'

'না!'

'কী করলে হয়?'

'মায়ের পেটের মধ্যে জন্ম নিতে হয়। তুমি আমার মা ঠিকই, কিন্তু আমি তোমার মেয়ে নই।'

'এ দেখছি তোর আচ্ছা যুক্তি। আমি মা হবো আর তুই মেয়ে হবি না? এটা কী ক'রে মেলে?'

'বোঝো না কেন, পেটের থেকে বেরুলে তবেই তো মানুষের ছেলে আর মেয়ে, কেমন? কিন্তু মাকে কি কেউ পেটের থেকে পায়? মা অমনি। চক্ষু চেয়ে ভালো লাগলেই মা।'

সহজ সরল যুক্তি। একেবারে অকাট্য। কী বলবেন মহামায়া? ধারণ করতে হয়, লালন করতে হয়, পালন করতে হয়, তবেই তো সন্তান। মিথ্যা কী বলেছে কুসুম। চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন। ভুরু কুঁচকে কুসুম বললো, 'তুমি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো দাদাবাবুর চেয়ে তুমি আমাকে সত্যি বেশী ভালোবাসো? না, বাসো না, কিন্তু আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি।'

মহামায়া বললেন, 'যদি তোর নিজের মা বেঁচে থাকতো তা হ'লে আর একথা বলতে পারতিস না।'

'হ্যাঁ-এ-এ-' কুসুম একেবারে নিঃশংশয়ে এতোখানি মাথা কাত করলো। 'তুমি যদি তখন এরকমই ভালোবাসতে আমাকে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বেশী ভালোবাসতাম। তা হয়। আমার এক পিসির ছেলেই তো আমার পিসির চেয়ে পিসির শাশুড়িকে বেশী ভালোবাসে, কিন্তু আমি যদি দাদাবাবুর চেয়েও বেশী ভালোবাসি, তুমি কিন্তু তবু তাঁকেই ভালোবাসবে।'

'পাগলী।'

'তা বলে বলছি না যে তুমি আমাকে ভালোবাসো না। বাসোই তো। এতো বাসো বলেই একটা কথা মনে হয়।'

'কী কথা শুনি?'

'বলো হাসবে না।'

'হাসবো কেন?'

'আমি শুনেছি মানুষ মরে গেলে তার শরীরটা নষ্ট হ'য়ে যায় কিন্তু আত্মাটা ঘুরপাক খেতে থাকে।'

'বাবা, তুই দেখছি অনেক বড়ো বড়ো কথা জানিস।'

'আমাদের দেশে পাঠ হয় তো, আমি শুনেছি।'

'তা ঘুরপাক খেতে খেতে আত্মাটা কী করে?'

'ফুস ক'রে কোনো আপন বংশের ভালোবাসার জনের পেটে এসে ছেলে হ'য়ে জন্মায়। আমার মায়ের আত্মাটা বোধ হয় কারো পেটে ঢুকতে না পেবে তোমার বুকের মধ্যেই ঢুকে পড়েছিলো, সেই জন্যেই পেটের মেয়ে না হ'লেও তুমি আমাকে এতো ভালোবাসো।'

'ঠিক বলেছিস। সত্যিই তুই আমার বুকের মেয়ে। আমার ফিরে-পাওয়া ফিরে-আসা মেয়ে।'

সজল চোখে মহামায়া তার পিঠে হাত রাখলেন।

॥ ১৭ ॥

খুব বৃষ্টি বাদল হ'য়ে গেল ক'দিন। কালবোশেখীর হাওয়া হ'লো খুব, আর সেই সঙ্গে জ্বরে পড়লেন মহামায়া।

কুসুমের মুখ শুকিয়ে এইটুকু হ'য়ে গেল। নিবারণ বললো, 'ভয় কী গো, সামান্য জ্বর, এখুনি সেরে যাবে।'

ছোটু সিং বললো, 'দাদাবাবুকে একঠো জরুর চিটঠি লিখিয়ে দাও, এসে পড়লেই জ্বরের ভূত ভেগে যাবে।'

মহামায়া বললেন, 'শরীর থাকলে অসুখ হবে না এ কখনো হয় ?'

কুসুমের মন প্রবোধ মানে না। ভয় করে তার। নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল সে। আর তার উপরে চোর এলো একদিন। খুব হৈ হল্লা চ্যাঁচামেচি হ'লো পাড়ায়। আর এই সব অমঙ্গল দেখে দপ ক'রে কুসুমের বুকের মধ্যে লাফিয়ে উঠলো একটা কথা, একটা যন্ত্রণার ঢেউ গড়িয়ে গেল বুকের এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্তে। সে পরিষ্কার বুঝতে পারলো তার অপরাধেই মহামায়ার অসুখ করেছে, চোর এসেছে, এর পর আরো কী হবে তা ই বা কে জানে।

মহামায়াকে যদি সে মা বলেই জানে, তবে তার মনের মধ্যে এমন কি কোনো লুকোনো কথা থাকা উচিত যা সে তাঁকে বলতে পারে না ? কিন্তু এতোদিন তার এই অপরাধবোধ ছিলো না ; এমন ক'রে ভেবেই দেখেনি ব্যাপারটা।

কিন্তু যে কারণেই হোক, যে ভাবেই হোক, অপরাধটা তো সাংঘাতিকই। আর সেটা গোপন রাখা আরো সাংঘাতিক।

সে চায়নি, সত্যিই সে চায়নি, নিজেকে বাঁচাবার তাগিদেই সে হাতের কাছে যা পেয়েছিলো ছুঁড়ে মেরেছিলো, তার এমনই ভাগ্যের ফের তাইতেই মরে গেল মানুষটা ? অমন ক'রে রক্ত ছুটে গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে ?

রক্ত দেখে বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এক মুহূর্ত, তারপরেই সে ছুটলো। রান্নাঘরের পিছন দিকে, গাবগাছের তলা দিয়ে, হারু কৈবর্তের ঘর পেরিয়ে, গোবর গাদা মাড়িয়ে, নীচু

জমির আল বেয়ে ছুটলো। আর এমন আশ্চর্য, সাপে কাটলো না তাকে, ভূতেও ঘাড় মটকালো না।

সে জানে এই অপরাধের শাস্তি আজীবন ফাটকবাস, নয়তো ফাঁসি। ফাঁসি বা ফাটকবাসের ভয়ে কাতর হ'য়ে সে দৌড়োয়নি। থানা পুলিশে তার ভয় নেই, মরণকে দিনের মধ্যে হাজারোবার ডেকেছে, হাজারোবার তার মুখোমুখি হবার প্রার্থনায় কেঁদেছে। আসল ভয় তার সেই জীবনকে, যে জীবন থেকে মুক্তি পেতেই সেই রাত্রে অমন ক'রে ছুটেছিলো সে। সে জানে এখন যদি ওরা তাকে পায়, এ নিয়ে পুলিশের কাছে যাবে না, নিজেরা মারবে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শুয়োরের মতো খাঁচায় আটকে মারবে। ছিনিমিনি খেলবে যুধিষ্ঠির। টুকরো টুকরো ক'রে মাংস খাবে।

ঘটনাটা ঘটে গেল। পাকে চক্রে ঘটে গেল। সেই রাত্রে পালাতোই সে, না পালালে ঘনশ্যামের লোভের কামড়ে সারা অঙ্গ পচে যেতো তার।

কিন্তু সব কথা কি বুঝবেন মা। সেই কি বোঝাতে পারবে। সে খুনী, সে একজন মানুষ মেরে ফেলে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে এখানে, এটাই ভাববেন তিনি। রুষ্ট হবেন, ঘৃণা করবেন, এতোদিন না বলে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সুবিধে নিয়েছে ভেবে বিশ্বাসঘাতক বলবেন।

সব সইতে পারবে কুসুম, শুধু মহামায়ার অবিশ্বাস সইবে না তার, মহামায়ার অনাদর তাকে আগুনে পোড়াবে। যতোদিন সে মহামায়ার স্নেহ পায়নি, ততোদিন তার মনে হ'তো বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক সুখের। ধুপছায়া গ্রামে থাকতে পুকুরঘাটে চাল ধুতে ধুতে কতোদিন তার মনে হয়েছে সেই পুকুরের ঠাণ্ডা জলের তলায় তলিয়ে যেতে। হাত-দা দিয়ে গরুর খড় কাটতে কাটতে কতোদিন নিজের গলায় তার কোপ বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছে, রাত্রির অন্ধকারে স্বামী যখন জন্তু হ'য়ে তার শরীরটাকে চেটে খেয়েছে ফাঁস লাগাতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু তা সে পারেনি। জলে ডুববে কেমন ক'রে, সে যে সাঁতার জানে, তার যতো দুঃখই থাকুক, সজ্ঞানে

কি মানুষ নিজেকে নিজে কুপিয়ে মারতে পারে। আর ফাঁসি? কখন লাগাবে? কোথায় লাগাবে? কেমন ক'রে লাগাবে, সে কৌশলটাও তো সে জানে না।

আর তা ছাড়া 'আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন' পাঠ শুনতে গিয়ে কতোবাব শুনেছে এ কথা। শেষে কি ইহকাল পরকাল দুই কালই সে নরকে পচবে? একালেও যুধিষ্ঠিরের জন্য পচলো, পরকালেও তার জন্যই পচবে? ওদের জন্য এতোবড়ো শাস্তিটা সে নেবে কেন? ওরা তার কে?

কেমন এক প্রতিহিংসার মতো মন থেকে তৎক্ষণাৎ মরবার বাসনাকে সে বিদায় দিয়েছে। শাশুড়িকে মেরে ফেলেছে বলে যদি ওরা থানার লোক ধ'রে এনে তখুনি ফাঁসি লটকাতো, সকলের আগে গলা পেতে দাঁড়িয়ে থাকতো কুসুম। পালাবার প্রশ্নই উঠতো না।

কিন্তু সে আশা ছিলো না। সে জানে সে আশা দুরাশা মাত্র। তা ওরা কিছুতেই করতো না। আবার সেই ধূপছায়া গ্রামের যুধিষ্ঠির কৈবর্তের ভাঙাঘরে নরক ঘাঁটা, যুধিষ্ঠিরের লোভের বিছানা, যুধিষ্ঠিরের বন্ধুর লালসার ইন্ধন। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন আবার সেই প্রত্যেক দিনের মরণ-যাতনা প্রত্যেক দিন।

কিন্তু মহামায়াকে কেমন ক'রে সে এতো কথা বোঝাবে। আর না বুঝে মহামায়া যদি তাকে সরিয়ে দেন তাড়িয়ে দেন, সে কষ্টই বা সে সহ্য করবে কেমন ক'রে?

মহামায়ার এই অপ্রত্যাশিত অযাচিত স্নেহের স্বাদ তাকে বদলে দিয়েছে। এখন সে বাঁচতে চায়। এই ঘাস মাটি ফুল বৃষ্টি, পৃথিবীর আলো হাওয়া সব যে এখন তার প্রাণ ভ'রে ভোগ করতে ইচ্ছে করে। মহামায়া তাকে তাঁর হৃদয়ে জায়গা দিয়েছেন, সন্তানস্নেহে গ্রহণ করেছেন, হাতে ধ'রে নিয়ে এসেছেন এই নতুন আশার জগতে, আলোর জগতে। তার তাপিত তৃষিত অন্তর সুধায় ভ'রে দিয়েছেন তিনি।

তিনি তাকে অনেক শিখিয়েছেন, অনেক বুঝিয়েছেন, তাঁর চোখে চোখ রেখেই সে প্রথম দেখতে পেয়েছে পৃথিবীটাকে। এ তার আর একটা জন্ম। তার নতুন জন্মের বিকশিত চেতনা তাকে এটুকু বুঝতে দিয়েছে, মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র উপকরণ শুধু খাওয়া আর ঘুম নয়। মানুষের বুকের ভিতরে আরো অনেক নাম-না-জানা বোধ আছে যা শুধু মানুষরাই উপলব্ধি করতে পারে। আর সেই নাম-না জানা চৈতন্য থেকেই তার হঠাৎ এমন বিবেকদংশন আরম্ভ হয়েছে। এই ভালোমন্দ বোধ যদি তার কিছুকাল আগেও এমন তীব্র থাকতো, নিশ্চয়ই নির্মল মনে সব অপরাধ স্বীকার ক'রে সব শাস্তি সে মাথা পেতে নিতো।

কোনো গোপনতাই তো তার স্বভাবে নেই। তবে এতোবড়ো কথাটা কেন সে গোপন করলো? সে বুঝতে পারেনি, এ যে কতো গুরুতর অপরাধ, মনে আসেনি তার। আর যখন মনে হ'লো, বেঁচে থাকার জন্য ব্যাকুলভাবে হাত বাড়ালো সে জগতের দিকে।

॥ ১৮ ॥

কিন্তু তবু কোনো এক নির্ঘুম রাত্রে তার সৎবুদ্ধি তাকে নিয়ে এলো মহামায়ার ঘরে।

ততোদিনে জ্বর ছেড়ে গেছে তাঁর, ভালো হ'য়ে গেছেন, সুস্থ হয়েছেন। তিনি ঘুমোন দেরিতে। শুয়ে শুয়ে মাথার কাছে একটা আলো রেখে বই পড়ছিলেন, কুসুমকে দেখে হাসলেন, 'কী রে, মা'র জন্য তোর ভয় কি এখনো গেল না নাকি? উঠে দেখতে এসেছিস মরে গেলাম নাকি?'

কুসুম রুদ্ধস্বরে বললো, 'মা, একটা কথা।'

'কী কথা?'

কুসুম উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো, নিঃশ্বাসটা ঘন হ'য়ে উঠলো। মহামায়া একটু অবাক হ'য়ে বললেন, 'কী হয়েছে রে?'

'মা'।

'কী ব্যাপার।' বইয়ের ভাঁজে আঙুল রেখে তিনি অবহিত হলেন।

'মা আমি একটা অন্যায় করেছি।'

'অন্যায়? কী অন্যায়?'

'শুনলে তুমি রাগ করবে, কষ্ট পাবে।'

'তাই নাকি?' গুরুত্ব না নিয়ে হাসলেন মহামায়া, 'কিছু ভেঙে ফেলেছিস?'

'না।'

'তবে?'

'আমার একটা গোপন কথা আছে।'

'তোরও আবার গোপন কথা?'

'আমি একটা সাংঘাতিক দোষ করেছি।'

'কী দোষ শুনি?'

'কিন্তু আমি ইচ্ছে ক'রে করিনি, হ'য়ে গেছে।'

'গেছে তো গেছে। যা এখন ঘুমিয়ে থাক গিয়ে। কাল সকালে শুনবো।' চোখ ফিরিয়ে অর্ধপঠিত বইয়ের পৃষ্ঠায় আবার তিনি মনোনিবেশ করলেন।

স্তিমিত গলায় কুসুম বললো, 'তুমি শুনবে না?'

'এতোই জরুরী, আজ না শুনলেই নয়?'

. . .

'আচ্ছা বল।'

'আমার ভয় করে বলতে।'

'কিসের ভয়?'

'তুমি আমাকে আর ভালোবাসবে না।'

'একবার ভালোবাসলে কি আর না বেসে থাকা যায়? তা সেই অপরাধটা কী, শুনি না।'

'ভয়ঙ্কর। সেই অপরাধটা যতো ভয়ঙ্কর, তোমার কাছে না বলাটা তার চেয়ে বেশী খারাপ।'

'চটপট বলে ফেল।'

'তুমি সব সময়েই বলো মানুষেরই মন থাকে, পশুর থাকে না। মানুষই নাকি তার জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে সেই মনকে দেখতে পায়। তুমি সেই জন্যই আমাকে লেখাপড়া শিখতে বলো, বই পড়ে শোনাও। আমি যে গরু ভেড়া নই, আমারও যে একটা মান সম্মান আছে, সংসারে বলবার কথা আছে, সহ্যের সীমা আছে, এ আমি তোমার কাছেই শুনেছি। তোমার কাছে বইয়ে লেখা গল্প উপন্যাস শুনতে শুনতে আমার কাছে কেমন পরিষ্কার হ'য়ে উঠতে চেয়েছে সব, আমি যেন দেখতে পেয়েছি, কে দূরে একটা আলো নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আমার যেতে ইচ্ছে করেছে সেই আলোর কাছে, চেষ্টা ক'রে ক'রে আমি ক্লান্ত হয়েছি কিন্তু কখনো ধরতে পারিনি সেই আলো। অসম্ভব কষ্ট হয়েছে আমার। কিন্তু সে কষ্ট কী রকম তা আমি জানি না। সেই কষ্টের সঙ্গে স্বামীর মার খাবার কষ্টের কোনো মিল নেই, খাওয়া পরার কষ্টেরও কোনো মিল নেই, কেবল একটা বুকচাপা যন্ত্রণা—'

একটু থামলো কুসুম।

তার কথা শুনে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন মহামায়া। কুসুমের এই চেহারা তার কাছে নতুন। নিজের হাতে গড়া মানুষটাকে তিনি পরম কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগলেন। কুসুম ঢোঁক গিললো, কোণে গিয়ে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেলো, হাতের আঁজলায় মাথা মুখে ছিটিয়ে যেন দিলো। আবার বললো—

'আমার যখন বিয়ে ঠিক হয়েছিলো, আমি কিছুই বুঝতাম না। কেবল সকলে যখন কানাকানি করলো নিতাইটা একটা চামার, দু'টো টাকার লোভে মেয়েটাকে এবার বলি দেবে, তখন খুব ভয় হ'লো। ভাবলাম আমাকে বুঝি কেটে ফেলবে, কাঁদতে কাঁদতে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। শেষে বুঝলাম, আসলে আমাকে কাটা হবে না, আমার স্বামীর বয়েস বেশী, স্বভাব খারাপ আর নেশাখোর বলে যে বদনাম আছে তার জন্যই লোকেরা এসব বলছে। তখন ভাবলাম বিয়ের দিন আমি লুকিয়ে থাকবো কোথাও। চেষ্টাও করেছিলাম, বাপ

ধ'রে আনলো, বসিয়ে দিলো পিঁড়িতে। কিন্তু বিয়ের পরেও যখন বাপের বাড়িতেই থাকলাম তখন আর ভয় রইলো না। যখন বড়ো হ'লাম, স্বামী ঘনঘন আসতে লাগলো নিয়ে যাবার জন্য। আমার এই মায়েরও সূতিকা হয়েছিলো, ছেলেপুলে হ'তে হ'তে হাত পা ফুলে যেতো, জ্বর হ'তো, অম্বল হ'তো, খেতে পারতো না। সংসারের কাজ করবে কে? ভাইবোনদের দেখবে কে? এই জন্যই বাপ আমাকে রেখে দিয়েছিলো। আর ছোটো ছিলাম বলে স্বামীও কিছু বলতো না। তার টাকার দরকার ছিলো, বিয়ে ক'রে সেটা পেয়েই চুপচাপ ছিলো, আমি বড়ো হ'য়ে উঠতেই আমার উপর নজর গেল তার। নেবার জন্য আসতে লাগলো বারে বারে, বারে বারে আমার বাপ তাকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য, রাতও কাটাতে দিতো, সেই সঙ্গে কিছু টাকাও দিতো। সন্তুষ্ট হ'য়ে ফ'রে যেতো সে। কিন্তু তারপরে তার লোভ বেড়ে গেল, বললো, আমি কি তোমার বৌয়ের সেবা করার জন্য আমার বৌ রেখে দেবো? তা হবে না। ঘরে আমারও বুড়া মা আছে, রাঁধাবাড়ার লোকের দরকার আছে, দাও তো দাও, বেশী ফন্দিবাজী করলে ত্যাগ করবো। তখন আর বাবা কী করে, দিয়ে দিলো। মাত্র দু' বছর এসেছি স্বামীর ঘরে। যতোদিন বাপের ঘরে ছিলাম ততোদিনও যে কষ্ট যে খাটুনি, স্বামীর ঘরেও তাই। তফাৎ বুঝলাম না কিছু।

'সারাদিন ভূতের মতো খাটা আর সন্দে লাগতেই ঘুম, এই। আমি দিনের বেলা এতো পরিশ্রম করতাম যে আলো ফুরুলেই যেন দম ফুরিয়ে যেতো। মধ্যে মধ্যে সৎমা আমাকে চুলের মুঠি ধ'রে টেনে তুলে কাজ করিয়ে নিতো, তবু বেশীর ভাগ দিনই ডাকতো না, না খেয়ে ঘুমিয়ে কেটে যেতো রাত। সৎমা বোধহয় একবেলার খাওয়াটা বাঁচতো বলে আর বেশী কিছু বলতো না। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, রাত্রেও শান্তি নেই আমার। এই ঘুমের জন্য যে কতো শাস্তি ভোগ করেছি, তা তোমাকে বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। আমার গা খুলে দেখ, কতো কালসিটে আর কতো লাথিগুঁতোর দাগ দেখতে পাবে।

রাত্রিবেলা নেশা করতো স্বামী, তারপর এসে আমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতো। আমি কাঁদতাম, সাপখোপের ভয় ভুলে বাঁশবনে গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম, ধ'রে আনতো সেখান থেকে, কোনো কোনোদিন সইতে না পেরে আমি জোর জবরদস্তি করতাম, তখন সে আমাকে মেরে হাড়গোড় ভেঙে দিতো, কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করতো, বলতো, বৌ হয়েছিস কী জন্যে?

'আসলে স্বামীর এই দিকটা কিছুতেই মিটতো না আমাকে দিয়ে, আর সেই জন্যে কোনো সময়েই তার রাগ মিটতো না। কেবল ভয় দেখাতো আরেকটা জোয়ান দেখে বিয়ে করবে বলে। আমি মনে মনে বলতাম, ঠাকুর, তাই যেন হয়, তাই যেন হয়। আমি সারাদিন সব করবো, কিন্তু রাত্রিটা শুধু আমাকে একা থাকতে দিও। কিন্তু ঠাকুর আমার কথা শুনতেন না। আর রাত্তিরের ঘুম নিয়ে শাস্তিও আমার কমতো না।

'অথচ কী আশ্চর্য দেখ, এখানে এসে আরো কতো কী অভ্যাসের মতো, একদিন দেখি সেই সন্ধে লাগতে ঢুলে পড়া অভ্যাসও আমার কখন চলে গেছে। হঠাৎ একদিন মনে হ'লো, আমার বুকের মধ্যে যেন একটা মনও আছে। তুমি যখন ভালোবাসো, সেই মনে আমার কান্না জমে ওঠে, তুমি যখন ভালো কথা বলো, ভালো বই পড়ে শোনাও, লেখাও পড়াও, সেই কান্না আমার বেরিয়ে আসতে চায়। তোমার আদরই আমার দুঃখ, আমার সুখ আমার সব। রাত্রে শুয়ে শুয়ে জেগে জেগে সেই সব কথাই ভাবি, সেই দুঃখ পেতেই আমার ভালো লাগে, তখন আমার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। তোমার দেওয়া সুন্দর বিছানায় শুয়ে আমার মন কেমন করে। রাত নিশুতি হ'য়ে আসে, সব শব্দ থেমে যায়, বাদাম গাছটায় পেঁচা ডাকে, প্রহরে প্রহরে পাখিরা ডানা ঝাপটায়, তবু আমার ঘুম আসে না।

'তারপর ভয় ওঠে বুকে, ভয়ে আমি হিম হ'য়ে যাই। ভয়ে গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেই ভয় আমার তোমাকে ছেড়ে যাবার ভয়। আর সেই ভয়েই আমি হাজার চেষ্টা ক'রেও আমার সবচেয়ে

গোপন কথাটা বলতে পারি না তোমাকে। আমার মনে হয় সে কথা শুনলে তুমি আর ভালোবাসবে না আমাকে। অথচ সেই কথাটা না বলেও আমি শান্তি পাচ্ছি না, আমি থাকতে পারছি না, আমি সাহসও পাচ্ছি না। মাগো, আমি কী করি বলো।'

এক দমকে এতো কথা বলে হাঁপাতে হাঁপাতে থামলো কুসুম।

ক'দিন বৃষ্টি হ'য়ে ঠাণ্ডা পড়েছে একটু। কুসুম তার আঁচলটা ঘন ক'রে জড়িয়ে নিলো গায়ে। একটা শিরশিরে বাতাস বয়ে গেল শব্দ ক'রে। মহামায়ার মাথার কাছের দেয়াল ঘড়িতে এগারোটা বাজলো। মহামায়া তাকালেন সেদিকে, তারপর খাটের বাজুর উপর ভাঁজ ক'রে রাখা তাঁর সর্বদা ব্যবহারের ছোটো চাদরখানা কুসুমের পিঠের উপর ছড়িয়ে দিলেন। মৃদু গলায় বললেন, 'সব কথাই যে সকলকে বলতে হবে, তার কী মানে আছে? দু'টো একটা কথা না-বলা থাকা ভালো। যা, ঘুমুতে যা।'

'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নয়। অন্যলোকের গোপন কথা আমিই বা শুনতে যাবো কেন? যা, শো গিয়ে।'

একটু দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে কুসুম আবার নিজের ঘরে ফিরে এলো। হঠাৎ বুকটা যেন পালকের মতো হালকা হ'য়ে গেল। একটু পরেই কতোদিন পরে পাশ ফিরে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে বললো, 'জানো মা, কাল রাত্রে না কালুটাকে স্বপ্ন দেখেছি।'

মহামায়া বললেন, 'কালু! সে আবার কে?'

'সেই কালু, আমার শ্বশুরবাড়ির কুকুরটা।'

'তোর শ্বশুরবাড়ির কালু? ওমা, তবে তো খুবই বিখ্যাত লোক!'

'লোক না গো, কুকুর।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তা কালুকে দিয়ে আবার কী স্বপ্ন দেখলি?'

'কালুটা যেন কাঁদছে।' বলতে বলতে কুসুমেরও প্রায় কান্না এলো, 'আর আমার মুখের দিকে কেমন ক'রে তাকিয়ে আছে। বড্ড রোগা তো, তার উপর কেবল ছাল চামড়া।'

'কেন?'

'ঐ লোমটোম সব পড়ে গেছে কিনা, তাই সকলে ওকে কেবল তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে।'

মহামায়া হেসে ফেললেন।

দুঃখিত হ'লো কুসুম, ছলছলে চোখে বললো, 'তুমি তো ওকে দেখনি তাই হাসছো।'

'না না, হাসবো কেন? ভাবছিলাম কালু নামটা তার কে রাখলো।'

'আমি ছাড়া ওর আর কে আছে বলো? কালো রং কিনা তাই কালু রেখেছি। আগে কালোবরণ ডাকতুম, সবাই বললে ওটা ঠাকুর দেবতার নাম, কুকুরের নাম আর ঠাকুরের নাম এক রাখলে পাপ হয়। তাই কালু ক'রে দিয়েছি।'

'বেশ নাম। দেখতে কেমন?' মনোযোগ দেখালেন মহামায়া।

কুসুম উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো, 'খুব সুন্দর, কালুর মুখখানা দেখলে তুমি তাকে ভালো না বেসে পারবে না, আর মাথা ঘষে ঘষে যখন আদর করে—'

কুসুম দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

'তোকে বুঝি খুব ভালোবাসতো!'

'বাসতো না! ঐ কালুটাই তো কেবল আমাকে ভালোবাসতো ও বাড়িতে। আমিও শুধু কালুকেই ভালোবাসতাম। দূর থেকে আমার গলা শুনলেই লেজ নাড়তো, দৌড়ে এসে চেটে দিতো, মাটিতে গড়াগড়ি দিতো। আমিও কোলে নিয়ে চুমু খেতাম।'

'ছোটো থেকে পুষেছিলি বুঝি?'

'পোষা না আরো কিছু। আগে বুড়ো শিবতলায় বসে থাকতো,

আমি একদিন পুজো দিতে গিয়েছিলাম, একটু আদর করতেই চলে এলো সঙ্গে সঙ্গে। এলে তো আর ফেলা যায় না, বলো ?'

'তাই তো।'

'আমার শাশুড়ি সে সব বুঝবে না। বলে, তুই ধরে এনেছিস। আর আমি ধ'রে এনেছি ভেবেই ওকে ধ'রে ঠেঙায়। কী কষ্ট লাগে আমার। কী করবো লুকিয়ে লুকিয়েই আদর করি, ভাত দি। কালুরও খুব বুদ্ধি, সে সব বুঝতো। ধরো আমাকে দেখে যেন খুব হাসছে, আমার শাশুড়িকে দেখলেই কোণের দাঁতটা বার ক'রে খিঁচিয়ে এক দৌড়।' বলতে বলতে দৃশ্যটা বোধহয় মনে পড়ে গেল, একচোট হেসে নিলো কুসুম।

মহামায়া বললেন, 'কুকুরটা তা হ'লে হাসতে পারতো ?'

'খুব। খুশি হ'লেই তো হাসতো। আমি পষ্ট বুঝতে পারতুম। একদিন শাশুড়ি রেগে চুপটি ক'রে গিয়ে এক বালতি গরম ভাতের ফ্যান ঢেলে দিলে গায়ে, বললে, নে খা।'

'ঈস্।'

'তারপর কী কান্না আর কী কান্না। আমি সেদিনও খুব রেগে গিয়েছিলুম। যেদিন আমার পিঠে আগুন দিলো সেদিনের কষ্টের চেয়ে একটুও কম কষ্ট হয়নি আমার কালুর জন্য। তখন আমি রাগ সামলাবার জন্য ঘরের বাঁশে খুব ক'রে কপাল ঠুকলুম, শেষে রক্ত বেরিয়ে গেল। সেদিন ঠুকে ঠুকে ঠিক মেরে ফেলতুম নিজেকে—'

'বলছিস কী ?'

'হ্যাঁ মা। কিন্তু মরলুম না কেন জানো ? মরলে কালুটাকে দেখবে কে। আমি ঠিক জানতাম, ও কেঁদে কেঁদে আমাকেই ওর দুঃখ বলছে। তখন আমি ছুটে ওর কাছে গেলাম। ওর সঙ্গে কাঁদতে লাগলাম। আমাকে কাঁদতে দেখে ও আর কাঁদলো না।'

'আহা রে।'

'তারপর আমি দুপুরবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরের কুলুঙ্গি থেকে নারকোল তেল নিয়ে গিয়ে ওর পোড়া ঘায়ে লাগিয়ে দিলাম, নিজে না

খেয়ে সব ভাত ওকে ধ'রে দিলাম। ও পেট ভ'রে খেয়ে একটু শান্ত হ'লো। সেই কালুটাকেই স্বপ্ন দেখেছি। যেন কেউ খেতে দিচ্ছে না, যেন আমাকে খুঁজছে।'

'আর একটা কুকুর পুষবি?'

'পুষবো।' দুই চোখে আলো জ্বালিয়ে ধরলো কুসুম, 'যদি বলো তা হ'লে লালিটাকে পোষা করি।'

'লালি আবার কে?'

ঐ যে রাস্তার ধারে বসে থাকে, আমাদের ফটকের কাছে ঘুমোয়, খুব সুন্দর। ও তো রোজ আসতে চায়।'

'বলেছে তোকে?'

কুসুম হেসে গড়িয়ে গেল, 'ওমা, কুকুর বুঝি বলে?'

'কেন, হাসতে পারলে বলতে বাধা কী?'

বিজ্ঞ হ'লো কুসুম, 'ও সব চোখ দেখে বুঝে নিয়ে হয়, চোখ দিয়ে ওরা সব জানাতে পারে। আমি যখুনি গেটের ধারে যাই, ছুটে ছুটে চলে আসে সেখানে, ল্যাজ নাড়ে, কুঁই কুঁই করে, চোখ দিয়ে গেট খুলে ভিতরে নিয়ে আসতে বলে। আমি যখন চুক চুক করি, পা দিয়ে মাটি আঁচড়ায়।'.

'নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে দিস?'

কুসুম অপরাধীর ভঙ্গিতে মুখ নিচু ক'রে রইলো।

মহামায়া বললেন, 'তার চেয়ে এক কাজ কর না।'

'কী।'

'শ্বশুরবাড়ি গিয়ে একদিন কালুকেই নিয়ে আয় না।'

'তা যদি হ'তো।'

'বাধা কী।'

কুসুম শিহরিত হ'য়ে ওঠে, 'ওরে বাবা।'

'এতো ভয় কিসের? যাবি, গটগট ক'রে নিয়ে চলে আসবি, আমি চেন বকলস কিনে দেবো।'

'না, না।'

'কেন, ওরা কি তোকে ধ'রে রাখবে?'

'রাখবে।'

'রাখলেই হ'লো?'

কুসুম নিরুত্তর।

'আমি ছোটু সিংকে পাঠিয়ে দেবো তোর সঙ্গে, যদি গোলমাল করে, তখুনি চলে আসবি।'

'আর আসবো!'

'কেন আসবি না! বরং একদিক থেকে সেটাই ভালো।'

'ওরা আমাকে আর আসতে দেবে না।'

'নিশ্চয়ই দেবে।'

কুসুম সজল হ'য়ে উঠলো।

মহামায়া বললেন, আমি ভাবছি কি জানিস, তুই যদি একবার নিজে গিয়ে জানিয়ে শুনিয়ে চলে আসিস তা হ'লে আর কোনো ভয় থাকে না। কিন্তু ধর, এখানে এসে লুকিয়ে আছিস এ কথা তো জানতেও পারে, আর তখন যদি এসে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায়?'

'না, না, জানবে না।' ত্রস্ত চোখে ভয়ের গভীর ছায়া ঘিরে এলো। 'কেমন ক'রে জানবে?'

'বলা তো যায় না!'

'তুমি যেতে দিও না।'

'আমি তোর কে বল?'

'তুমি আমার মা।'

'তুই বয়সে ছোটো, তুই একজনদের বৌ, একজনদের মেয়ে, আমার কী সাধ্য আছে তারা এসে চাইলে জোর ক'রে ধ'রে রাখবার? তারা শুনবে কেন?'

'মা।'

'আর খোঁজ পেলে তারা আসবেই, ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই তারা খুঁজছেও। প্রতিশোধ নেবার জন্যই খুঁজছে। আইন সম্পূর্ণ ওদের দিকে; আর যা খারাপ লোক। লুকিয়ে রেখেছি বলে আমাকেও

বিপদে ফেলতে পারে।'

বলতে বলতেই মহামায়ার মন উদ্বেগাকুল হ'য়ে উঠলো। এতোদিন এদিন থেকে ভাবেননি তিনি। এসেছে, আছে, থাকছে, সুতরাং ও থাকবেই, ও তাঁরই, তিনিই ওকে বাকী জীবন মা হ'য়ে রক্ষা করবেন, ভালোবাসবেন, শাসন করবেন, এটাই ধ'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে বুঝতে পারলেন সে ধারণা তাঁর ভুল। কুসুমকে তিনি যতোই ভালোবাসুন, তবু উঠতে বসতে যারা কুসুমকে আগুনে পুড়িয়েছে সে তাদেরই। কুসুম সত্যি বলেছিলো, নিজের পেটে না জন্মালে সন্তান নয়। কুসুমের উপর তাঁর কোনো অধিকার নেই। ভাবতে ভাবতে কষ্ট হ'লো তাঁর। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হ'লো।

জন্মগত অধিকারের দাবী কী প্রচণ্ড!

॥ ১৯ ॥

সেদিনই তিনি ছোটু সিংকে পাঠিয়ে খোঁজ নিলেন, ধুপছায়া গ্রাম এখান থেকে কতো দূর। সত্যি সত্যি সেখানকার লোক কখনো এখানে এসে কুসুমকে খুঁজে বার করতে পারে কিনা।

দুপুরে গিয়ে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ ক'রে ফিরে এলো ছোটু সিং। বাসে ক'রে পুরো দশ মাইল রাস্তা। দু'টো গ্রামের মধ্যে অনন্ত বিস্তীর্ণ ধানখেত, আমবাগান আর জলাজঙ্গল।

নতুন ক'রে অবাক হলেন তিনি। এই আট মাইল পথ বেয়ে এই মেয়ে এক রাতে এক দৌড়ে চলে এসেছে আর-এক গাঁয়ে? তা হ'লে কতো ভয়ে কতো যন্ত্রণায়, কতো ধিক্কারে এই অসাধ্য সাধন করেছে ও।

'আচ্ছা ছোটু', ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'ওদের বাড়িটা দেখলে? লোকগুলোকে দেখলে?'

'কী ক'রে দেখবো মা, তুমি তো নাম বলে দাওনি।'

তাও তো বটে।

'আর গ্রামের লোকগুলো কী রকম? কুসুমের বিষয়ে কেউ কথা বলছে এমন কানে এলো?'

ছোটু সিং হাসলো, 'বৌমা যে কী বলছে শোনো। বাসে গেলুম, নামলুম, ঘুরে চলে এলুম। হামাকে বি চেনে কে, হামি বি কাকে চিনি। চেনাউনা থাকবে, সাক্ষাৎ-উক্ষাৎ হোবে তোবে তো কথা?'

তাই তো।

চুপ করলেন মহামায়া।

'আমি ভাবছি কি—' আবার ঘুরে এলেন তিনি ছোটুর কাছে, 'জানতে পারলে এখানে এসে না হামলা করে।'

খইনি টিপতে টিপতে নিরুদ্বেগে ছোটু বললো, 'কার ঘাড়ে ক'টা মাথা নিয়ে আসবে দেখলিয়ে দেবো।'

'ও সব জোর-জবরদস্তির কথা না ছোটু, ওরা এলে কুসুম ওদেরই. দিয়ে দিতেই হবে, আর নিয়ে গিয়েই তো মেয়েটাকে—না না, এর একটা বিহিত করা দরকার।'

'তুমি ঠাণ্ডা হও তো বৌমা। তোমার কিছুবি ভয় নেই। একবার আসতে দাও, কী করি বুঝিয়ে দেবো। ঐটুকু কুসুমদিদি, অত ভালো কুসুমদিদি, তাকে ওরা অমন করিয়ে মারধোর করিয়েসে, মারধোর কাকে বলে একদম দেখলিয়ে দেবো।'

'দেখিয়ে দিলে উল্টে তোমারই শাস্তি হবে আইনে।'

'আইন বি দেখা আছে হামার। আইন তুমি কেতাবে রাখিয়ে দাও। হামি বলছি, জান থাকতে কেউ কুসুমদিদিকে লিয়ে আর কাউকে ঘাঁটাতে দিব না, ঐ কুসুমদিদি হামাদের বাড়ির তোমারই লেড়কি, তোমার লেড়কিকে কে লিবে? লড়হাই হোবে না?'

ছোটুর এতো ভরসাতেও কিন্তু শান্ত হ'তে পারলেন না মহামায়া। এক ফোঁটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না। দিনে রাত্রে ভয় লেগে রইলো তাঁর মনে।

কিন্তু সত্যি কি এতোদিনও ওরা খুঁজছে কুসুমকে? কেন? কুসুমের জন্য ওদের কিসের মাথা-ব্যথা? এতোদিনে বিয়েও ক'রে ফেলেছে হয়তো আর একজনকে, আবার আর-একটা মেয়ে গেছে সেই যন্ত্রণার আবর্তে। হয়তো মেয়েটা দেখতে ভালো, হয়তো তাকে দিয়েও মা আর ছেলে রোজগারের লোক খুঁজছে। ঈস। কী ভীষণ! এদের কথা কেউ জানে না, কেউ এ পাপের শাস্তি পায় না। কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলেন, এক ধরনের ব্যবসায়ী বেরিয়েছে, যারা বিয়ের ছাড়পত্র নিয়ে বৌকে গিয়ে পারস্যের উপকূলে বিক্রী ক'রে দিয়ে আসে। পুরাকালের 'ভরার মেয়ে' প্রথার মতোই এই ক্রীতদাসী বিক্রী করা। পুরুষের লালসার ইন্ধন জোগানো। দু'দিনেই ফুরিয়ে যায় সেই শরীর, আবার নতুন শরীর কিনে ভোগ করা।

এরাও তো তাই। এদেরও তো প্রায় সেই ব্যবসাই। যদি কোনরকমে ধরতে পারে কুসুমকে তা'হলে কি আর ছাড়বে? নিজের বৌ হিসেবে নিশ্চয়ই আর পাঁচমাস নিখোঁজ মেয়েকে জায়গা দেবে না। কিন্তু স্ত্রীলোক হিসেবে নিজেও ভোগ করবে। বাবুদেরও ডেকে আনবে ঘরে।

আর কুসুম! এমন সুন্দর মেয়ে কি রোজ রোজ দেখা যায়? ওকে কে না পছন্দ করবে? কে না চাইবে! কিন্তু কেউ কি নেই যে ওকে ভালোবেসে রক্ষা করবে?

ছেলের অভাব অনুভব করলেন তিনি। সোমেন থাকলে বুদ্ধি দিতে পারতো, সাহস দিতে পারতো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারতো। কিন্তু এখন কে তাকে রক্ষা করবে এই দুর্ভাবনা থেকে।

আবার তিনি চিঠি লিখলেন ছেলেকে।

সোমেন,

এতোদিনে আমার কাছ থেকে কুসুমের অনেক খবরই তুমি জেনেছ। দিনে দিনে সে আমার আরো কাছের মানুষ হ'য়ে উঠেছে,

অতি দ্রুততার সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা চালচলনের পরিবর্তন হচ্ছে, রুচি মার্জিত হচ্ছে, আর সবচেয়ে আশ্চর্য, এই মার্জনার জন্য আমি আমাকে বাহবা দিতে পারি না, সেটা ওর নিজেরি পাওনা, ওর নিজের মধ্যেই ভালোকে ভালো বলে নেবার সহজাত প্রবৃত্তি ছিলো। অনুকূল আবহাওয়ায় সেটা বিকশিত হ'তে পারছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, ওকে কী করে নিরাপদে রাখি। ওর শ্বশুরবাড়ির গ্রাম মাত্র দশ মাইলের ব্যবধানে। যে কোনোদিন খোঁজ পেয়ে যেতে পারে যে, এখানে আছে। এবং পেলেই ওরা আসবে। যার স্ত্রী যার মেয়ে তাদের অধিকার সর্বাগ্রে। ভালোবাসার জন্য না নিক, আর তা নিশ্চয় নেবেও না, নিগ্রহ করার জন্য নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে জোর ক'রে। আইনগতভাবে আমি ওকে কোনো কারণেই তখন রাখতে পারবো না নিজের কাছে। সেই জন্যই কয়েকদিন যাবত আমি মনে মনে অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে আছি। অবিরাম ভাবছি এইসব আত্মীয় নামধারী শত্রুদের কবল থেকে কী ক'রে ওকে বাঁচাই। কেবলি মনে হচ্ছে তুমি কাছে থাকলে আমার সব ভাবনার অবসান হ'তে পারতো।

তুমি আমাকে গ্রামের বাস ছেড়ে কলকাতা চলে যাবার কথা বলছিলে, আমি খরচের কথা ভেবে সাহস পাইনি। এখানকার জমি জায়গা বাগান পুকুর থেকে আমাদের যা বাৎসরিক আয় হয়, ছেড়ে গেলে আর তা হবে না। তুমি জানো সেই আয় এক কথায় ছেড়ে দেয়া সহজ নয়। যদি নিবারণকে নিয়ে যাই, আর ছোটু সিংকে রেখে যাই, তা হলে হয়তো সামান্য কিছু পাবো, কিন্তু ছোটু সিং বুড়ো হয়েছে, অবসর নেবার সময় হয়েছে, সে আর ক'দিন দেখতে শুনতে পারবে। তখন বারো ভূতে লুটে খাবে সব।

এখন মনে হচ্ছে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য হ'লেও এসব কথা না ভেবে এই অসহায় মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্য আমার কলকাতা চলে যাওয়া উচিত। তুমি বরং একটা বাড়িরই খোঁজ করো। বাড়ি ঠিক করতে পারলেই চলে যাবো। তোমার আশাপথ চেয়ে আছি। যতো

তাড়াতাড়ি পারো, একবার এসো।

আশা করি, তোমার ছাত্রী পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে তৈরী হয়েছে। সমীর আর বৌমাকে আমার আশীর্বাদ দিও, তুমি নিও।—মা।

চিঠিটি লিখে, ভালো ক'রে মুখ আটকে ডাকে পাঠিয়ে অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। মুখ হাত ধুয়ে পুজোয় বসলেন এসে। পূজো সেরে বাগানে এলেন। ফুলগাছের ভিতরে ভিতরে ছোট ছোট আগাছা জন্মেছে, কুসুম দৌড়ে গিয়ে একটা নিড়ানি নিয়ে এলো পরিষ্কার করবার জন্য। পূর্ণ উদ্যমে লেগে গেল কাজে। এই মাটি ঘাঁটার কাজে তার ভীষণ গরজ।

মহামায়া বললেন, 'কুসুম, কলকাতা যাবি?'

কুসুম তৎক্ষণাৎ রাজী, 'কলকাতা! সে খুব ভালো হবে মা।'

'কি ক'রে জানলি ভালো হবে?'

খুশিতে চক চক করলো সে, 'বাঃ, এ আর কে না জানে। কতোবড়ো সহর, কতো দোকান পাতি সিনেমা থিয়েটার, দাদাবাবু—'

হেসে ফেললেন মহামায়া, 'সিনেমা থিয়েটার আর দাদাবাবু বুঝি এক?'

কুসুমও হাসলো, 'দাদাবাবু কেমন মা?'

'এলেই দেখবি।'

'আমার ভাবতেই ভয় করে।'

'যাকে ভাবতেই ভয় করে, তার কাছে গিয়ে থাকবি কী ক'রে?'

'সে আমি পারবো।'

'যাওয়া দিয়ে হচ্ছে কথা, না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু গেলে যে আর আসতে পারবি না তা জানিস।'

'দরকার কী আসবার?'

'বাঃ, এতোকাল এখানে কাটালি, মায়া নেই?'

'তুমিও তো যাবে।'

'আমার ছেলে আছে সেখানে, আমাকে তো যেতেই হবে।'

'আমারও তেমন মা যাচ্ছেন, তাই যাচ্ছি।'

'তোর তো মা ছাড়াও অন্য টান আছে।'

'কিচ্ছু নেই।'

'আজ মনে হচ্ছে কিচ্ছু নেই, কিন্তু একদিন দেখবি সেই দুঃখই আবার মনকে তোর গ্রামে টানবে।'

'টানবে না।'

'সে কি কেউ জোর ক'রে বলতে পারে?'

'আমি পারি।'

'তা হয় না। আমার কাছের এইটুকু সময়ের মধ্যেই কি আর অতগুলো বছরের স্মৃতি নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে তোর মন থেকে?'

নিড়ানি ফেলে মহামায়ার মুখের দিকে তাকালো কুসুম, চোখ নামিয়ে নিয়ে বললো, 'আমি আর কোনোরকমেই নতুন হ'তে পারি না, না?'

একটু থমকালেন মহামায়া। গাছের শুকনো পাতাগুলো ঝেড়ে দিলেন ডাল থেকে, ফুলের ব্যাস মাপলেন, তারপর আস্তে বললেন, 'তুই কি তাই চাস?'

'তাই চাই। তাই চাই।'

'কিন্তু ওরা তো তোকে ভুলবে না।'

'ওদের কথা ওদের, আমার তাতে কী?'

'সেই দাবীতেই হয়তো একদিন খুঁজতে খুঁজতে হাজির হবে এসে।'

'আমি বলবো আমি ওদের চিনি না।'

'লোকে তা মানবে কেন?'

'আমি তো মানবো। তুমি তো মানবে।'

'তাতে কিছু প্রমাণ হবে না।'

'তবে কি ওরা যা বলবে তাই সকলে সত্যি ভাববে?'

'এই নিয়ম।'

চুপ করলো কুসুম। একটু পরে বললো, 'না, এই, নিয়ম আমি মানবো না। আমি ঈশ্বরের নামে বলবো আমি ওদের কেউ নই, কেউ ছিলাম না, কেউ হ'তে পারি না। আমি ওদের চাই না, চাই না, চাই না।' বলতে বলতে গলা বন্ধ হ'য়ে এলো। মহামায়া আর কথা বাড়ালেন না।

তারপর সারাদিন আনমনা হ'য়ে রইলো কুসুম। রাত্রিবেলা শোবার আয়োজন করতে করতে মহামায়া হেসে বললেন, 'সারাদিন এতো কী ভাবছিস রে?'

কুসুম এক পলক তাকিয়ে থেকে বললো, 'আচ্ছা মা, স্বামী যেমনই হোক, তবু কি তাকে ভালোবাসতে হবে, ভক্তি করতে হবে? তার কাছেই পড়ে থাকতে হবে?'

জবাব দিতে একটু ইতস্ততঃ করতে হ'লো মহামায়াকে। বললেন, 'সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।'

'তার মানে ওটাই নিয়ম নয়।'

'ভালোবাসা দু'জনের মধ্যে থাকাই নিয়ম।'

'আমিও তো তাই বলি। ও বাড়ির জ্যাঠাইমা বলছিলেন, স্বামী মারুক ধরুক, কাটুক, তবু স্বামী। তাই ফেলে তুই পরের বাড়ি পড়ে আছিস কেন?'

মহামায়া স্থির চোখে তাকালেন, কথাটা অনুধাবন করতে চেষ্টা ক'রে তারপর বললেন, 'তুই কি জবাব দিলি?'

'আমি বললাম মা আমার পর নয়, মা আমার সবচেয়ে আপন। মা ছাড়া আমার কেউ নেই। তাইতে ঠাকুরমাও হাসলেন, জ্যাঠাইমাও হাসলেন। বললেন, মা তো এতো শিক্ষা দেয়, এই শিক্ষাটা দেয় না কেন যে বিয়েওলা মেয়েকে শ্বশুরঘর ছাড়িয়ে রাখতে নেই। নিজের মেয়ে হ'লে কি রাখতো? তুই যে তার কাজের মেয়ে। তুই গেলে যে সেবা চলবে না।'

মহামায়ার চোখে লালের ছিটে লাগলো।

বললেন, 'তারপর ?'

'তখন আমি রেগে গিয়ে বললাম, মা আমাকে নিজের মেয়ে আর কাজের মেয়ের ভাগাভাগিতে ভাবেন না। আমি যেন জন্তু না হ'য়ে থাকি, যেন মানুষ হই এই শিক্ষাই দেন।'

কুসুমের কথা শুনে মহামায়ার বেদনা প্রশমিত হ'লো। শাশুড়ি-জা'য়ের পরশ্রীকাতরতা তিনি ক্ষমা ক'রে ফেললেন।

আস্তে হাত বুলিয়ে দিলেন কুসুমের মাথায়।

একটু হাসলো কুসুম, 'কিন্তু রমাদি সব সময়ে আমার পক্ষে ছিলেন। বলছিলেন, তোমাদের কেবল বাজে কথা। রমাদির মা বললেন, এতো তো সারাদিন রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পড়ে থাকতে দেখি তোর মাকে, বলি দময়ন্তীব গল্প জানিস ? সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প জানিস ? শুনেছিস কোনোদিন তাঁদের কথা ? তাঁরা তাঁদেব স্বামীর জন্য কতো কষ্ট করেছিলো, বলেছে তোর মা তোকে ? মানুষ হবার শিক্ষা তো খুব নিচ্ছিস শুনলাম। এই শিক্ষাটা নিসনি কেন ? আমিও রাগ হ য়ে বললাম, মা আমাকে সে শিক্ষাও দিয়েছেন। নল-দময়ন্তী গল্পের নলরাজা কোনোদিন দময়ন্তীকে মারেননি। সত্যবানও কোনোদিন সাবিত্রীকে একটা জোরে কথা ব'লেননি। অমন স্বামীর জন্যই মানুষ অত কষ্ট সইতে পারে, যমের সঙ্গে হেটে হেঁটে চলে যেতে পারে, আমিও পারতাম।'

'এতো কথা বলেছিস তুই ?' খুশিতে অধীর হ'য়ে গেলেন মহামায়া।

'কেন বলবো না ?' ভ্রূকুটি করলো কুসুম, 'আসলে কি জানো মা, তুমি যে আমাকে এতো ভালোবাস তা ওঁরা পছন্দ করেন না, কেবল আমাকে যা তা বলে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে চান। আজকে বড়োবৌদি আর রমাদি তাই নিয়ে খুব তর্ক করেছেন।'

মহামায়া চুপ ক রে রইলেন।

'কিন্তু রামকে আমার ভালো লাগে না।' কুঁজো থেকে একগ্লাশ

জল ভ'রে মহামায়ার মাথার কাছে ঢাকা দিয়ে রাখলো কুসুম।

'রাম! রাম আবার কে।'

'রাম! সীতার স্বামী রামচন্দ্র।'

'ও রামচন্দ্র? কেন তাঁর আবার কী দোষ পেলি?'

'অনেক।'

'রামের কোনো দোষ থাকতে পারে না। তিনি সম্পূর্ণ মানুষ।'

'তবে তিনি সীতাকে বিসর্জন দিলেন কেন?'

'তাতে তাঁর দোষ কী?'

'তাঁর হুকুমেই তো হ'লো।'

'কী করবেন, প্রজারা সন্দেহ করছিলো—'

'করলেই হ'লো। তিনি কি আর জানতেন না সীতা নিষ্পাপ।'

'কেন জানবেন না। তিনি তো নারায়ণ—'

'তবে?' কপালে হাত ঠেকালো কুসুম; বিড় বিড় ক'রে বললো, 'দোষ নিও না ঠাকুর, কিন্তু সত্যি বলছি তোমাকে আমার পছন্দ হয় না।'

'রাম যে একজন আদর্শ রাজা ছিলেন তা জানিস তো?' ওর ঠাকুরভক্তির নমুনা দেখে মহামায়া না হেসে পারলেন না।

ভুরু কুঁচকে কুসুম বললো, 'আর যার বিষয়ে যা-ই হোক, সীতার বিষয়ে তিনি তা নন।'

'সীতাকে তিনি তাঁর প্রাণের মতো ভালোবাসতেন।'

'তাই বুঝি বিসর্জন দিলেন?'

'এটা তো জানিস, প্রজারা ছিলো তাঁর কাছে সন্তান, তেমনি ক'রেই পালন করতেন তাদের। তাঁর রাজত্বে কারো মনে কোনো দুঃখ ছিলো না, অসন্তোষ ছিলো না, শোক ছিলো না।'

'তাই যদি হবে তবে নিজের ছেলেদের কেন আশ্রমে ফেলে রাখলেন। পরের ছেলেদের ভালোবাসলে বুঝি নিজের ছেলেদের ভালোবাসতে হয় না।'

পরিষ্কার যুক্তি। এবার রামের পক্ষে উকিল হবার জন্য বুদ্ধিতে

একটু শান দিতে হ'লো মহামায়ার। সমকক্ষের মতো তর্ক ক'রে বললেন, 'সীতাকে যখন রাম অতদিন পরে রাবণের ঘর থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলেন স্বভাবতই লোকেদের মনে হ'লো সীতাকে রাবণ নিশ্চয়ই অপবিত্র করেছে, তাঁর ধর্মনাশ হয়েছে—'

'যদি হয়ই তাইতেই বা সীতার কী দোষ ? সে তো পুরুষের দোষ।'

'খুব পুরুষবিদ্বেষী হয়েছিস তো।' কুসুমের পিঠে হাত রাখলেন তিনি, 'তা হও, কিন্তু রামকে নিন্দে করলে সইতে পারবো না। রাম যে কোথায় মহৎ সেটাই বুঝতে হবে তোমাকে। শোন, প্রজারা যখন সীতাকে নিয়ে কানাঘুষা করতে লাগলো, বাতাসে বাতাসে কানে গেল রামের। তিনি ব্যথিত হলেন, কিন্তু চুপ ক'রে রইলেন। তারপর একদিন রাজসভাতে প্রকাশ্যেই উঠে পড়লো কথাটা। খোলাখুলি ভাবেই ব্যক্ত হ'য়ে গেল প্রজাদের মনের ভাব। তারা বললো, রাজা হ'য়ে রামই যদি এই অনাচারের প্রশ্রয় দেন, এই অপবিত্র স্ত্রী নিয়ে ঘর করেন, প্রজা হ'য়ে আমরা আর তবে কী ক'রে আমাদের অবিশ্বাসিনী স্ত্রীদের শাস্তি দেবো। তারা তো তখন রাজার নজীর টানবে। আর আমাদের জীবন দুর্বিষহ হবে। এ কথা শুনে রাম মাথা নীচু করলেন, তাঁর প্রাণ বিদীর্ণ হ'য়ে গেল। কিন্তু তিনি রাজা, প্রজাপালনই তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো ধর্ম, ব্যক্তিগত সুখদুঃখে ভেঙে পড়লে তাঁর চলে না, প্রজাদের সুখ-দুঃখ সুবিধে-অসুবিধেই আগে দেখতে হবে, তাদের তুষ্ট করতে হবে। তখন তিনি ভাবলেন, এখন আমি কী করি ? এতোগুলো লোকের মনোবেদনার কারণই হই, না কি প্রাণস্বরূপা জানকীকেই বিসর্জন দিই। শেষ পর্যন্ত রাজার কর্তব্যকেই তিনি বড়ো আসন দিলেন, নিজের দুঃখ ভুলে সীতাকে বিসর্জন দিতেই সংকল্প করলেন। তার মানে কি জানিস, সকলের জন্য তিনি নিজের কলিজা উপড়ে দিলেন। ভেবে দ্যাখ কতোবড়ো ত্যাগ।'

গভীর মনোযোগের সঙ্গে একপলকে তাকিয়ে সমস্ত কথাগুলো কুসুম হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করলো। অনেকক্ষণ পরে বললো, 'তা বলে রাবণকেও কিন্তু কিছু নিন্দে করতে পারো না।'

'রাবণ? রাবণ আবার কী ভালো কাজ করলো? রাবণের জন্যই তো যতো অনর্থ।'

'কিন্তু লক্ষ্মণই তো আগে তার বোনকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তোমরা তো বলো রাবণরা রাক্ষস, ওরা লোভী, ওরা অসভ্য, কিন্তু লক্ষ্মণের ব্যবহার একটুও ভদ্র হয়নি। তার তুলনায় রাবণ অনেক ভালো ব্যবহার করেছে। বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাইলে সেও তো সীতাকে যথেষ্ট অপমান করতে পারতো। বলো? বরং রামই স্বামী হ'য়ে সীতাকে অপমান করেছিলেন।'

কুসুমের সরল মনের তীব্র ভালো-মন্দ-বোধের বিচারে এবং মুখস্থ রামায়ণ বিদ্যায় আহ্লাদে আটখানা হলেন মহামায়া, সেই সঙ্গে কুসুম যে কতো পরিণত হয়েছে সেটাও উপলব্ধি ক'রে অবাক না হ'য়ে পারলেন না। এতোবার পড়েও এদিক থেকে তো তিনি কোনোদিন ভাবেননি, শেষে কুসুমের ভাবনাটাই তাঁকে ভাবালো। যে মেয়ের মনের মাটিতে এক ফোঁটা বিদ্যার সার নেই, শুধু কানে শুনে শুনে এই বোধ! মনে মনে কুসুমকে প্রশংসা করলেন তিনি, মুখে না বোঝার ভান ক'রে বললেন, 'রাম আবার কখন অপমান করলেন সীতাকে? তুই দেখি সব নতুন তথ্য আবিষ্কার করছিস।'

'বাঃ, যখন উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলেন, সকলের সামনে দিয়ে নিজের রাণীকে হাঁটিয়ে আনতে তাঁর কষ্ট হ'লো না, হাজার হাজার লোকের সামনে নিজের স্ত্রীকে অসতী বলতে তাঁর খারাপ লাগলো না! তারপর পঞ্চাশবার তার পরীক্ষা। এগুলো অপমান নয়? তোমাকে বললে তুমি অপমানিত হ'তে না?'

মহামায়া চুপ ক'রে রইলেন।

'সীতা যে পাতাল প্রবেশ করেছিলেন, আমি খুব খুশি হয়েছি, ঠিক শিক্ষা হয়েছে। যাত্রাতে তো সীতার পাতাল প্রবেশ আমি দেখেছি, নিজে যতো কেঁদেছি, ততো খুশি হয়েছি রামের কান্না দেখে।'

মহামায়া এক পলক তাকালেন, শুয়ে পড়ে বললেন, 'যা, ঘুমো গিয়ে।'

॥ ২০ ॥

দু'দিন পরেই হাতে হাতে জবাব এসে গেল সোমেনের চিঠির। ছেলে যে তাঁর সমস্যায় এতো তৎপর হ'য়ে তক্ষুনি জবাব লিখবে, এতোটা মহামায়া আশা করেননি। তাঁর মনের তলায় একটু সংশয়ই ছিলো বরং। এই পাঁচ মাসে অন্তত পঁচিশবার তিনি ছেলেকে কুসুমের বিষয়ে নানাভাবে নানা কথা একটু একটু ক'রে লিখে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ছেলে নীরব। যেন বাড়িতে সেই মানুষটার অস্তিত্বের কোনো আভাসই সে জানে না।

এতো তাড়াতাড়ি জবাব পেয়ে একটু বেশীই খুশি বোধ করেছিলেন, ভেবেছিলেন, এতোদিন সোমেন ইচ্ছে ক'রেই এড়িয়ে যায়নি, নামটা অগ্রাহ্য করাও উদ্দেশ্য ছিলো না, প্রয়োজন বোধ করেনি তাই। কিন্তু যতো খুশি মনে চিঠিটা খুললেন, পড়বার পরে আর তাঁর সেই খুশি রইলো না।

মা,

সব খবর জানলাম। চিরদিনই তুমি যা ভালো বুঝেছ, তাই করেছ, তেমনি এই ব্যাপারটার সঙ্গেও আমার কোনো যোগ বা কোনো সক্রিয় কর্তব্য আছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না এবং ভাবছিও না, এবং তোমার মতামতের উপরে আমার নিজের মতামতও আমি চাপাতে চাইছি না। তোমার চেয়ে সাংসারিক কোনো কিছুই আমি বেশী ভালো বুঝি বলে আমার মনে হয় না।

তবুও কিছুদিন থেকেই আমি এ বিষয়ে কিছু লিখবো লিখবোই ভাবছিলাম। কেননা সম্প্রতি আমার মনে হচ্ছে এই মেয়েটিকে নিয়ে তুমি একটু বেশী জড়িয়ে পড়ছ, সেটা আমার মনঃপুত নয়—তোমার চিঠি পাওয়ার পরে সে বিষয়ে আমি আরো বেশী নিশ্চিত হয়েছি। আমার মনে হয় তোমার আমার নিরিবিলি সংসারে অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে নতুন উপসর্গ হিসেবে উপস্থিত না করলেই ভালো ছিলো। তুমি নিশ্চয়ই বলবে, উপস্থিত সে নিজেই হয়েছে, এব

মধ্যে তোমার কোনো হাত ছিলো না এবং সেটা নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু এরকম একটি অল্পবয়সী মেয়ে এভাবে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলে তার সম্পর্কে এর চেয়ে আরো একটু বেশী সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখাই যুক্তিসঙ্গত। আমি নিজে হ'লে তাই করতাম। যদি ঝগড়াঝাটি ক'রে এসে কাজ নিতো, তার একটা যুক্তিও থাকতো, মুক্তিও থাকতো। কিন্তু পালিয়ে থাকাটা স্বাভাবিক নয়। কারো কোনো দায়িত্ব নিয়ে তুমি নিজেকে বিব্রত করো এটা আমার ইচ্ছে নয়। আর আমার স্বভাবও তুমি জানো। আমি শামুকের মতো গুটিয়ে থাকতেই অভ্যস্ত। কোনো গোলমালের মধ্যে যেতে আমার ঘোরতর অনিচ্ছা। এইজন্যে স্কুলের বালক থাকাকালীন বড়ো এবং ওস্তাদ ছেলেদের কাছে আমি প্রচুর নির্যাতিত হয়েছি আমার চিঠি পেয়ে বা আমার এই পরামর্শ শুনে তুমি হয়তো দুঃখিত হবে, কিন্তু তবু আমি বলছি তোমার কুসুম নামীয় কন্যাটিকে নিয়ে কলকাতা ওভাবে চলে আসাটা আমি একটুও অনুমোদন করি না। যদি ওর আত্মীয় পরিজন এসে নিয়ে যায় তা হ'লে তো খুবই ভালো, নয়তো তুমিই তাদের খোঁজখবর ক'রে মেয়েটিকে বুঝিয়ে তার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দাও। তোমার এই সাময়িক সুখাবাস থেকে তার স্বামীর ঘরেই সে শেষ পর্যন্ত অনেক বেশী ভালো থাকবে। বরং তুমি না হয় তাকে কিছু টাকাকড়ি দিও, তাতে ওর উপকার হবে। আজ মেরেছে বলে স্বামীরত্নটি যে চিরদিনই মারবে এমন কোনো কথা নেই। নাকি সেই রাগ এখনো তার আছে? হয়তো কতো অনুতপ্ত হয়েছে, কতো খুঁজেছে, না পেয়ে কষ্টও হয়েছে নিশ্চয়ই। বিয়ে যখন করেছে, ঘর যখন বেঁধেছে, যতোই ঝগড়া করুক, মারামারি করুক, সেই সঙ্গে মায়ামমতাও আছে নিশ্চয়ই। এই সব অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে হৃদয়াবেগ সম্বরণ করার ক্ষমতা থাকে না, রাগ দুঃখ ভালোবাসা সবই প্রবল। রাগ করলে মারে, দুঃখ পেলে চ্যাঁচায়, ভালোবাসলেও এমনি সরবেই তা প্রকাশ করে। সুতরাং সেই প্রস্তরযুগের হাতাহাতি, মারামারি, কাটাকাটি থেকে এটা তুমি

ভেবে নিও না যে ওদের মধ্যে কোনো প্রেম-প্রণয় নেই। সবই আছে। তুমি মেয়েটিকে তার ঘরেই ফিরিয়ে দাও।

আমি আবার বলছি, ওকে এভাবে না বলে কয়ে কলকাতা আনাটা তোমার ঠিক হবে না। তাতে ওর ক্ষতিই হবে। কলকাতা এসে মেয়েটি তার নিজের সমাজও খুঁজে পাবে না, এই সমাজেও খাপ খাবে না, স্বাভাবিক সরলতা হারিয়ে আরো কষ্ট পাবে। তা ছাড়া একটি বিবাহিত মেয়ে, এমন নয় যে লিখিয়ে পড়িয়ে কোনো ভদ্র এবং সহৃদয় যুবকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একটা হিল্লে ক'রে দিতে পারবে। নানাদিক থেকে বঞ্চিত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত ওর দুঃখ বাড়বে বই কমবে না, তার চেয়ে ও যা আছে তাই থাকাই ভালো।

যাই হোক, যে কারণেই হোক, তুমি যখন একবার কলকাতা আসবে বলে ঠিক করেছ, সেটার যেন আর নড়চড় না হয়। এখানে বাড়ি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। একটা ভদ্রপাড়ায় একটু ভদ্রগোছের বাড়ির যা দাম তার অঙ্ক শুনলে তুমি হাত তুলে চ্যাঁচাবে। আমার মতো একজন কলেজের মাষ্টারের পক্ষে কলকাতা সহরে গড়ের মাঠে হারিয়ে সূঁচ খুঁজে বেড়ানোও যতো কঠিন বাড়িও ঠিক তাই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আগামী মাস থেকে একটি খুব ভালো বাড়ি পাবার আশা দেখা দিয়েছে। বাড়িটি বড়ো, আমি আর সমীর দু'জনে একসঙ্গে নেবো ঠিক করেছি। দু'ভাগ করলে দু'জনের অংশেই পুরো দু'খানা ঘর বাথরুম রান্নাঘর ইত্যাদি পড়বে। কষ্ট হবে না।

আমি গ্রীষ্মের ছুটির আগে আর যেতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। যাই হোক, যখনি যাই তুমি কলকাতা আসার জন্য যতোটা পারো তোমার সংসার গুছিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে থেকো। প্রণাম নিও।—ইতি

সোমেন

চিঠিপড়া শেষ হ'য়ে যাবার পরেও মহামায়া চিঠিটা চোখের তলায় পেতে স্থির হ'য়ে বসে রইলেন। হাঁটু ভেঙে পায়ের কাছে বসে কুসুম সেলাই করছিলো। মুখ তুলে বললো, 'দাদাবাবুর চিঠি, না মা?'

অন্যমনস্কভাবে মহামায়া বললেন, 'হুঁ।'
'আসতে বুঝি অনেক দেরি আছে?'
'না, শীগ্‌গিরই আসবে।'
'তবে তুমি মুখ মলিন করেছ কেন?'
'কই, না তো।'
'আমি দেখছি, করেছ।'
'তুই তো সবই দেখিস।'
'কলকাতার বাড়ি ঠিক হ'য়ে গেছে?'
'কিসের বাড়ি?'
'আমরা যে যাবো।'
'ও।'
'এবার এসেই কি নিয়ে যাবেন?'
'না।'
'কেন?'
'আমার ছেলে তোকে তোর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে বলেছে।'
'তাই তোমার মন খারাপ?'
'তুই চলে গেলে তো খারাপ লাগবেই।'
'আমি কি যাচ্ছি?'
'পরের মেয়ে পরের বৌ, আমি আর ক'দিন ধ'রে রাখবো?
'যদি কখনো পর থেকে থাকি, এখন তো আর নই?'
'এখন কী?'
'এখন ঘরের মেয়ে।'
'লোকে তো তা স্বীকার করছে না।'
'লোক কি দাদাবাবু?'
'দাদাবাবু কেন, সকলেই। ও বাড়ির কথাও শুনছিস। সকলেই বলছে যার নিজের বাপ আছে, স্বামী আছে—'
'সকলের কথা দিয়ে আমরা কী করবো?'
'তবে কার কথা শুনবো, বল?'

'তুমি যা বলবে তাই হবে।'

'আমার কতোটুকু সাধ্য। তোকে সেদিন বললাম, ওরা খোঁজ পেলেই আসবে, দাবী করবে, নিয়ে যাবে, লুকিয়ে রেখেছি বলে উল্টে মামলা করবে।'

'করলেই হ'লো?'

'কিছু বাধা নেই।'

'কেন আমি কি ছোটো? আমি কি বলতে পারি না কিছু?'

'কী বলবি?'

'যা সত্য তাই বলে দেবো। আমি তো নিজে এসেছিলাম তোমার কাছে, তুমি আমাকে দয়া ক'রে রেখেছ। আমি জিজ্ঞেস করবো, নেশা ক'রে স্বামী যদি মারে তা না হয় মারলো, তা বলে টাকা নিয়ে অন্যের কাছে শুতে বলবে? আর আমার বাবা? কই, বাবাও তো আমাকে থাকতে দিলেন না সেই রাতে। তুমি না রাখলে আমি কোথায় যেতাম!' মহামায়ার হাঁটুতে হাত রাখলো সে। 'তুমি দাদাবাবুকে ভালো ক'রে লিখে দাও মা, এবার যেন এসেই আমাদের নিয়ে যান। এখানে আর থাকার দরকার নেই আমাদের।'

'কিন্তু সে-ও যদি অন্য লোকেদের মতো ঐসব কথাই বলে, কলকাতা না নিয়ে যেতে চায় তখন কী হবে?'

কুসুমের চোখে অবিশ্বাসের হাসি টলটল ক'রে উঠলো, 'দাদাবাবু কক্ষনো বলবেন না।'

'কলকাতা গিয়ে কী করবি তুই?'

'তোমার কাজ করবো, দাদাবাবু যা বলেন শুনবো।'

'জানিস তো আমার ছেলে ছাত্র পড়া'য়, মাষ্টার মানুষ। লেখাপড়ায় মনোযোগ দেখলেই সে সব ভুলে যাবে, খুশী হবে, একটুও রাগ থাকবে না। সে কথা মনে থাকে যেন।'

চকিতে চোখ তুললো কুসুম, ব্যস্ত হ'য়ে বললো, 'আমার উপর কি রাগ করেছেন নাকি দাদাবাবু! আমি আছি বলে কি অসন্তুষ্ট হয়েছেন?'

'না না, অসন্তুষ্ট হবে কেন ? তোকে কি সে দেখেছে ?'

'তুমি তো লিখেছ।

'চিঠিতে আর কতোটুকু বুঝবে।'

'জানো মা তুমি ছাড়া আমাকে কেউ দেখতে পারে না। দাদাবাবু এসে হয়তো আমাকে তাড়িয়ে দেবেন।'

মহামায়া হেসে বললেন, 'পাগলি। তুই তো আমার মেয়ে, এ বাড়িতে তোর সমান অধিকার। তাড়াবে কে ?'

চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল কুসুম। দুই চোখভরা বিশ্বাস নিয়ে আস্তে বললো, 'তা আমি জানি।'

॥ ১১ ॥

দেখতে দেখতে সোমেনের আসবার দিন ঘনিয়ে এলো। চঞ্চল হ'য়ে উঠলো মহামায়ার প্রাণ। সময় দীর্ঘ মনে হ'তে লাগলো। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবনা চিন্তারও অন্ত রইলো না। ছেলের চিঠিটাকে তিনি মন থেকে উড়িয়ে দিতে পারেননি, অনেক যুক্তিপূর্ণ কথা আছে সেখানে। কুসুম বিষয়ে সত্যিই অনেক কিছু ভেবে দেখবার আছে। তা ছাড়া উপযুক্ত ছেলে, তার মতামত, তার ইচ্ছা এসবকেও মূল্য দিতে হয় বৈকি। সোমেনের যে কাজে একান্তভাবে অমত সে কাজ তিনি বিনা দ্বিধায় করতে পারেন না। অন্তত করা উচিত নয়। তা ছাড়া শুধু সেই চিঠিই নয়, তারপরেও সে আবার লিখেছে, সে যাবার আগেই যেন মহামায়া কুসুমের একটা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেন।

বলা যায় না, এসে হয়তো রাগ হবে, বিরক্ত হবে। মায়ের কাছে এসে বিশ্রাম হবে না তার। কিন্তু মহামায়াই বা কী করতে পারেন ? একজন মেয়ে হ'য়ে আর একজন মেয়েকে কী ক'রে আবার ঐ নরকে ফেরত পাঠাতে পারেন। সবটাই কি নিজের সুবিধে ? মানুষের তো বিবেকও আছে একটা ?

যতো ভাবেন, কুসুমের উপর মমতা তাঁর আরো গভীর হ'য়ে ওঠে,

শিকড় আরো গভীরে যায়। দ্বিগুণ মনোযোগের সঙ্গে তিনি কুসুমকে লেখান পড়ান, যোগ্য ক'রে তুলতে চেষ্টা করেন। তাঁর ছেলে এলে কুসুম কী করবে, কী বলবে, কেমন ক'রে মন জোগাবে, সারাদিন তালিম দেন সে সব। সোমেন যদি নিতান্তই বৈরী হয়, তা হ'লে কী কী তর্ক করবেন তার যুক্তি খোঁজেন মনে মনে। আসলে সোমেনের সঙ্গে নয়, নিজের মনেই তাঁর দ্বিধা দেখা দিয়েছে, তার সঙ্গেই তিনি যুদ্ধ করেন। যেভাবে একটি অপরিচিত অপরিণত মেয়েকে তিনি গড়ে তুলছেন, সেটা সত্যি তার জীবনের পক্ষে কল্যাণকর হচ্ছে কিনা সেটাই তাঁর সমস্যা। তিনিও ভেবে দেখেছেন কুসুমের ব্যর্থ জীবনে শেষ পর্যন্ত কোনো পরিপূর্ণতাই আনতে পারবেন না তিনি, মাঝখান থেকে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম হবে, চোখ মেলে তাকিয়ে সংসারের আর পাঁচজনকে দেখতে শিখে সেই আয়নায় নিজের চেহারা আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। তখন? তখন কী দিয়ে তিনি ওর হৃদয় ভরাবেন? স্বামী, সন্তান, সংসার কী পাবে সে? যে মেয়ের একটা জলজ্যান্ত স্বামী জীবিত, সেই সধবা মেয়েকে কে বিয়ে করবে? মিথ্যে কথা বলতে পারবেন তিনি? বলতে পারবেন, এ মেয়ে সম্পূর্ণ তাঁরই' এর অন্য কোনো পরিচয় নেই? এই মেয়ে যদি তাঁর কাছে আবাল্য মানুষ হ'তো তবু বা সম্ভব ছিলো, কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের পরিচিত একটা অচেনা মানুষকে ছদ্মবেশ পরিয়ে কার চোখে ধুলো দেবেন তিনি? দিলেই লোকেরা অস্বীকার ক'রে নেবে কেন? সোমেনই নেবে না। আর সোমেন নিলেও ভবিষ্যতে তার স্ত্রী তা নেবে কেন? শেষ পর্যন্ত সেই পরের সংসারীর গলগ্রহ হ'য়ে বেঁচে থাকা। পরের করুণার ভিখিরি হ'য়ে মন জোগানো।

তা ছাড়া এরকম একটি সুন্দরী মেয়েকে সৎভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করাই কি কম কঠিন কাজ নাকি? এইখানে এই গ্রামের চার দেয়াল ঘেরা বাড়িতেই তিনি মধুমক্ষিকার আনাগোনা টের পাচ্ছেন। ভাসুরের ছেলেরা একটু ঘন ঘন খোঁজ নিতে আসছে কাকিমার। কুসুমের হাতের চা পান খেয়ে বেশ তৃপ্তি লাভ করছে তারা, আর

কলকাতা তো এর চেয়ে আরো কতো ভীষণ জায়গা। কুসুম শিশুর মতো সরল, তার আত্মপর ভেদ কম, নিজের যৌবন সম্পর্কে সে এখনো অচেতন। তার দাহিকা শক্তির খবর এখনো সে জানে না। মিথ্যেকথা, প্রবঞ্চনা, ঠকানো, এসব কিছুই সে বোঝে না। তার দু'টি বৃত্তিই শুধু জাগ্রত। এক হচ্ছে মহামায়ার উপর তার এক দুরন্ত ভালোবাসা, অন্যটি সব-কিছুতেই ভয়। এর মাঝখানে কিছু নেই।

যতো ভাবেন, ভাবনার পরিধি বাড়ে, আরো উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ওঠেন' কুসুমের প্রতি রক্ষণবৃত্তি আরো প্রবল হ'য়ে ওঠে।

॥ ২২ ॥

পরীক্ষা হ'য়ে গেল শর্মিষ্ঠার। বেশ ভালো পরীক্ষা দিলো।

সোমেন বললো, 'চমৎকার।

ভুরু বাঁকিয়ে শর্মিষ্ঠা বললো, 'বিশেষণটা কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'লো জানতে পারি কি?'

সোমেন বললো, 'নিশ্চয়ই আপনার উদ্দেশ্যে।'

'তবু ভালো।'

'আপনি কি ভাবছিলেন?'

'যা ভাবা স্বাভাবিক।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে পেরেছেন বলে হয়তো নিজেকেই নিজে তারিফ করছেন।'

'ঠাট্টা?'

'মোটেও নয়। সত্যকে স্বীকার করতে আমার কোনোকালেই লজ্জা নেই।'

'সত্যটা কী?'

'যদি পাশ করি তো আপনার দৌলতেই করবো।'

'বেশ বিনয় আছে দেখছি।'

'কিন্তু আমার কাছেও আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

'কী কারণে?'

'বাঃ এতোবড়ো একটা কৃতিত্ব দেখাতে পারলেন কা'র দয়ায়? আমার মতো ছাত্রী ক'জন পাইয়ে দিতে পারে মাষ্টারকে? আমি ঘোড়া হলুম বলেই না আপনি গাধা পিটলেন।'

হাসলো সোমেন।

সমীর বাড়ি ঠিক ক'রে এলো সন্ধ্যাবেলা। জমিয়ে বসে বললো, 'বুঝলে, এজন্য আমাকে তোমাদের সেলামী দেয়া উচিত। এরকম একখানা বাড়ি এই সমীর হালদার ছাড়া আর কারো সাধ্যে খুঁজে বার করা কুলোতো না। কী কাণ্ড ক'রে যে ভদ্রলোককে জপিয়ে-জপিয়ে আদায় করলুম।'

কৃষ্ণা বললো, 'আহা, জপাবার কী আছে? উনি ছেড়ে দেবেন, আমরা নেবো, সোজা কথা।'

'সোজা কথা। জানো কতো লোক পড়েছিলো এর জন্য ভদ্রলোকের কাছে? বাড়িটা যদি ভদ্রলোক বাড়িওলার হাতে ছেড়ে দিতেন এর তিনগুণ ভাড়া হ'য়ে যেতো।'

'বাড়িওলার হাতে ছাড়বেন না তো কার হাতে ছাড়বেন? ভাড়া দেবো কাকে?'

'বুদ্ধি তো গজগজ করছে পণ্ডিতানীর মাথায়। ভদ্রলোক নিজের নামে আমাকে বসিয়ে চলে যাবেন, কাজেই আমি মাসে মাসে পুরোনো ভাড়া দিতে পারবো।'

'অতএব', শর্মিষ্ঠা জমিয়ে বসলো, 'এসো আমরা এই সুখবরটাকে সেলিব্রেট করি। চলো সিনেমা দেখি।'

ছুটি হ'য়ে গেছে, পরীক্ষা হ'য়ে গেছে, ভালো পরীক্ষা হয়েছে, বাড়ি পাওয়া গেছে, সকলের মনই লঘু আনন্দে সায় দিলো তৎক্ষণাৎ। ঠিক হ'লো পরের দিন বিকেলে সিনেমা দেখে, চীনে রেঁস্তোরায় খেয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করা হবে। আর তার পরের দিন সোমেন বাড়ি

যাবে। বন্ধু, বন্ধুপত্নী আর বন্ধুর শ্যালিকার জন্য একটি ছুটির দিন এভাবে উৎসর্গ করতে পেরে সুখী হ'লো সোমেন।

সকাল আটটা চল্লিশে ট্রেন। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিলো। বেশ একটু বিদায়-বিদায় গন্ধ দিচ্ছিলো সমস্ত আবহাওয়াটাতে। খুব ভোরে উঠে কৃষ্ণা আর শর্মিষ্ঠা চা করলো, টোস্ট করলো, কিছু খাবার তৈরী ক'রে সঙ্গে দিয়ে দিলো। ট্যাক্সীতে উঠতে গিয়ে একটু মন কেমন করলো সোমেনের।

সমীর বললো, 'গিয়েই চিঠি লিখবে, বুঝলে?'

সোমেন বললো, 'নিশ্চয়ই।'

কৃষ্ণা বললো, 'তাড়াতাড়ি আসবেন মাকে নিয়ে, আমি ততোদিনে নতুন বাড়ি গুছিয়ে রাখবো।'

শর্মিষ্ঠা বললো, 'আর তার আগে সদলে গিয়ে একদিন হাজির হবো আপনার বাড়িতে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তা হ'লে কিন্তু খুব ভালো হয়—' কথাটা লুফে নিয়ে সোমেন সনির্বন্ধ হ'য়ে বললো, 'না গেলে কিন্তু রাগ করবো।'

হয়তো কিছু জবাব দিয়েছিলো শর্মিষ্ঠা, শোনা গেল না, হুস ক'রে চোখের পলকে ট্যাক্সী গলি ছাড়িয়ে তাকে নিয়ে বড়ো রাস্তায় এসে পড়লো।

সুন্দর সকাল। এই মেঘলা সকালগুলো এতো ভালো লাগে সোমেনের। মোছা মোছা আকাশে তাকিয়ে সে খুশি হ'লো। বৈশাখের নিদাঘ, এর শোভাই অন্যরকম। এই মেঘে বৃষ্টির চেয়ে হাওয়া বেশী। সেই হাওয়ার আদর চোখে মুখে চুলে ঢেউ হ'য়ে হ'য়ে গড়িয়ে যেতে লাগলো। ঝিরি ঝিরি একটু বৃষ্টিও নামলো স্টেশনে পৌঁছুতে পৌঁছুতে। ভাগ্যিস নামলো। যা গরম পড়েছিলো। কষ্ট হ'তো পথে।

সময়মতোই পৌঁছলো এসে। ছুটি উপলক্ষে অনেকেই বাইরে

যাচ্ছে, অসম্ভব ভিড় হয়েছে। ঠেলে ঠুলে কোনোরকমে একটি সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট কেটে গুছিয়ে বসলো ট্রেনে, ভেণ্ডারকে ডেকে এক কাপ চা খেলো, একটি কাগজ কিনে, সিগারেট ধরালো। ভাবতে ভালো লাগলো কতোদিন পরে সে মাকে দেখবে।

॥ ২৩ ॥

হাওড়া থেকে কাঞ্চনপুরের দূরত্ব মাত্রই একশো তেরো মাইলের। পৌঁছুতে দেরি হ'লো না।

কিন্তু স্টেশনে পৌঁছুনোটাই সেখানে বড়ো কথা নয়। সেখান থেকে কাঞ্চনপুর সহরের বক্ষঃস্থলে পৌঁছুনোর রাস্তাটাই অসম্ভব কষ্টকর। চল্লিশ মাইল টানা বাসে যেতে হয়। আর তারও পরে দু'মাইল সাইকেল-রিক্সা। অবশেষে বাড়ি।

এই রাস্তাটা ভাবতেই গায়ে জ্বর আসে সোমেনের। বাসে আবার একটি ফার্স্ট ক্লাশ আছে। সামনের একখানা সরু বেঞ্চ পিতলের শিক দিয়ে আলাদা করা, পাশাপাশি পাঁচজন কায়ক্লেশে বসতে পারে। ভাড়া কিছু বেশী। চেহারা পশুর খাঁচার মতো। বলাই বাহুল্য ঐ ক'টি আসনের জন্য এতো অধিক সংখ্যক লোক সচেষ্ট থাকে যে হুড়োহুড়ি মারামারি ক'রে দখল না করা পর্যন্ত বিশ্বাস নেই পাবে কি পাবে না।

সে সব কথা ভাবতে ভাবতেই স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমেছিলো সোমেন, নেমেই দেখলো একগাল খুশি নিয়ে উৎসুক চোখে দাঁড়িয়ে আছে ছোটু সিং।

দু'জনকে দেখে দু'জনেই অকৃত্রিমভাবে আনন্দিত হ'য়ে উঠলো।

'তুমি! তুমি এসেছ!'

'আসবো না! তুমি আসবে কোতোদিন পোরে, আর হামি টিশনে আসবো।' স্যুটকেসটা সোমেনের হাত থেকে নিজের হাতে নিলো ছোটু, 'তাপোরে ভালো আছো?'

'তুমি ভালো আছো?'

'আর ভালো। বুড়হা হইয়ে গেলে আর ভালো কী।'

'কিন্তু তুমি এতো কষ্ট ক'রে না এলেই পারতে। তবু সকালটা বৃষ্টি হ'য়ে ঠাণ্ডা ছিলো, এখন কী রোদ উঠেছে দেখেছ? খুব গরম। খুব কষ্ট হবে তোমার, আসা যাওয়া—'

ফার্স্ট ক্লাশের দু'টি সীট আগেই রিজার্ভ ক'রে এসেছিলো ছোটু সিং, ধীরে ধীরে স্টেশন পার হ'তে হ'তে সোমেনের পিঠ চাপড়ে দিলো সে, 'হামি আসচি কাঞ্চনপুর সোহোর থেকে আর তুমি আসচো কলকাত্তা থেকে, কষ্টটা কা'র বেশী হইয়েছে শুনি?'

'আহা, আমার তো এ ছাড়া উপায় নেই, আসতেই হবে। তা বলে তুমি কেন কষ্ট করবে?'

'এ হামার কোষ্টো না খোকাবাবু, এ হামার সুখ।' সোমেন এতোবড়ো হয়েছে, এত লেখাপড়া শিখেছে, চাকরী করছে, কিন্তু নিবারণ আর ছোটু সিংয়ের কাছে সে এখনো খোকাবাবু। অবিশ্যি ইদানিং তারা দু'জনেই তাকে সমুবাবু ডাকা ধরেছিলো, কিন্তু আজ আনন্দের মুখে খোকাবাবুটাই বেরিয়ে এসেছে।

বাস ছাড়বার যদিও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে কিন্তু সেদিকে কোনোদিনই বাসওয়ালারা ভ্রূক্ষেপ করে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত না ভিড় আকণ্ঠ ঠেসে ওঠে চিৎকরে ক'রে ডাকতে থাকে যাত্রীদের। তারপর যাত্রীরাও যখন মরীয়া হ'য়ে দম আটকে পরিত্রাহি চিৎকার ক'রে গালাগাল দিতে শুরু করে তখন লাফিয়ে উঠে, পা-দানিতে পা রেখে, এক হাতে রড ধ'রে ঝুলে পড়ে আর-এক হাতে বাসের গায়ে ঘুষি মেরে কণ্ডাক্টার হুকুম দেয়, 'চলাও।'

কিন্তু চলাও বললেই বাস চলতে পারে না। কোনো কোনোদিন পারে, কোনোদিন পারে না। এখানে সপ্তাহে হাট হয় দু'দিন। সে দু'দিন চলতে প্রাণান্ত।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিনও হাটবার ছিলো। স্টেশন থেকে বেরিয়েই রাস্তার দু'পাশে সারি সারি দোকান বসে গেছে সব। এলুমিনিয়মের

বাসন আর প্লাস্টিকের খেলনা থেকে শুরু ক'রে হাঁড়ি-কুড়ি, হাতা চামচে, ছুরি কাঁচি পর্যন্ত হেন জিনিস নেই যা আসেনি। মেয়েদের জন্য লাল শালু পেতে তার উপরে হরেকরকম মনোরঞ্জনী দ্রব্য সাজানো রয়েছে থরে থরে। হালুইকর বসেছে মিষ্টির দোকান নিয়ে। মাছিদের ঢেউ সরিয়ে চলা দায় সেখানে। এদিকে পাঁপর ভাজা হচ্ছে, সেদিকে বাতাসা বানানো হচ্ছে। কাঁচা বাজারও কম বসেনি। সবই ভালো কিন্তু হাঁড়ি কলসি আর কলার কাঁদি ভর্তি গোরুর গাড়িগুলোই সর্বনাশ করেছে বেশী। নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা জুড়ে, বেঢপ ভঙ্গিতে। বাস যাবে বলে সে কিছুমাত্র বিচলিত নয়।

কণ্ডাক্টারই নেমে নেমে সরিয়ে দিচ্ছে একটু একটু ক'রে, আবার উঠছে, সাম্লনয়ে দোকানীদের সরে বসতে বলছে একটু পথ দেবার জন্য। এই ক'রে ক'রে পাঁচমিনিটের রাস্তা আসতে পঁচিশ মিনিট লাগছে।

সোমনাথ বললো, 'মাকে তো এবার কলকাতা নিয়ে যাবো, ছোটু ভাই।'

ছোটু সিং বললো, 'তা তো লিবেই, তা তো খুব সুখেরই কথা। লেকিন হামার খুব কোষ্টো হোবে। নিবারণের বি কোষ্টো হোবে।'

পাকা দাড়িতে হাত বুলোলো সে, 'মা'বও বি হামাদের ছাড়িয়ে খুব কোষ্টো হোবে, কেবল কুসুম দিদিটাই রাতদিন ভাবছে কোথোন যাবে।'

'কে ?' চট ক'রে মুখ ঘোরালো সোমেন।

'কুসুম। কুসুম। বৌমা যে নতুন লেড়কি পেয়েছে একঠো; জানো না ?'

'সে এখনো আছে ?'

'থাকবে না তো যাবে কোথায়।'

'কেন, তার বাড়ি নেই !'

'আরে সেই বাড়ি থেকেই তো পালিয়ে এসেছে। ভারী বদমাস লোক সব।'

'তা বদ হোক আর সৎ হোক, যার যার বাড়িতে তার তো থাকতেই হবে।'

'বৌমা ওকে আর ছাড়হিয়ে দিবেন না।'

'কিন্তু আমি লিখেছিলাম—' হঠাৎ অত্যন্ত রাগ হ'লো সোমেনের; সে বুঝলো মা একে কলকাতা না নিয়ে গিয়ে ছাড়বেন না। গম্ভীর হ'য়ে বসে আর কোনো কথা না বলে রাস্তা দেখতে লাগলো।

॥ ২৪ ॥

আজ মহামায়ার বিশ্রাম নেই। মহামায়ারও না, কুসুমেরও না। অবিশ্যি কারই বা আছে। নিবারণই কি সতেবো বার সতেরো কাজে ছুটছে না? ভোর না হ'তে উঠে ছোটু সিংকেই কি স্টেশনে যাবার তোড়জোড় করতে হয়নি?

সারা বাড়িতে যেন একটা উৎসবের হাওয়া লেগে গেছে। মহামায়া চঞ্চল পায়ে এঘরে ওঘরে যাচ্ছেন, দৌড়ে আসছেন রান্নাঘরে। সকাল থেকে যে কতো আয়োজন করেছেন খাবারের, তার অন্ত নেই। যা যা ছেলে ভালোবাসে তার কিছু বাকী রাখেননি। এবার সমু বড়ো বেশীদিন পরে আসছে। এতোদিন আর ছেড়ে থাকেননি আগে। প্রাণটা যেন কেমন করছে।

বাড়িঘর আয়না ক'রে ফেলেছে কুসুম। তিনদিন ধ'রে সে সব ঝাড়ছে মুছছে আর গুছোচ্ছে। যত্নের পালিশে ঝক ঝক করছে জিনিসপত্র। আলমারি থেকে ভালো ভালো কাপ ডিস বেরিয়েছে। কাচের গ্লাস বেরিয়েছে। সোমেনের প্লেটে খাওয়া অভ্যেস, সেই প্লেট বেরিয়েছে। সাজানো রয়েছে টেবিলের উপরে। গামছার বদলে মস্ত তোয়ালে বার করা হয়েছে স্নানের জন্য, দামী সাবান এসেছে, তাও সব সাজানো রয়েছে বাথরুমে। একটা মানুষের প্রতীক্ষায়

যেন গম গম করছে বাড়িটা।

এমনকি কুসুমের নব্যপোষ্য লালি কুকুরটাও যেন আজ বুঝেছে কিছু, সকাল থেকে পড়ে আছে বাড়িতে। অন্যদিন এ সময়ে তার সারাগ্রাম টহল দেওয়া হয়, আজ বোধহয় মাছ মাংসের গন্ধে আর বাড়ি ছাড়ার কথা সে ভাবেনি। কুসুম তাকে বেশ ক'রে স্নান করিয়ে দিয়েছে, হাজার আপত্তি সত্ত্বেও একটা লাল ফিতে বেঁধে দিয়েছে গলায়, মনে মনে ভেবে রেখেছে, দাদাবাবু এলেই একটা বক্‌লস কিনে দিতে বলবে। মহামায়া তাকে যেমন এ ক'দিন সমস্তক্ষণ তালিম দিয়েছেন, 'দাদাবাবু এলে এই করবি, ওই করবি, বাধ্য হ'য়ে চলবি, সুন্দর হ'য়ে থাকবি, বেশী ছুটোছুটি করবি না, ঘনঘন চা দিবি—' কুসুমও তেমনি লালিকে দু'হাতে জড়িয়ে আদর করতে করতে হাজারো শিক্ষা দিয়ে রেখেছে।

'শোন, দাদাবাবু এলে বেশী পাড়া বেড়াবি না।

'খাবার দেখলেই যে টসটস ক'রে লালা পড়ে, সেটা ফেলবি না

'হ্যাংলামি করলে ভয়ানক বকবো।

'আর শোন, বেশ লক্ষ্মী হ'য়ে চলাফেলা করবি।

'সকাল হ'লেই এই যে সূর্যবাবুর হোটেলে পাত চাটতে যাস তা যেন যাবি না

'না, রমাদিদের বাড়িতে গিয়েও বাচ্চাদের খাবার দিকে তাকিয়ে লোভ দিবি না।

'আর শোন, দাদাবাবু কলকাতার লোক, ফট ক'রে যেন পায়ে-টায়ে গড়িয়ে পড়িস না।

'বেশ নরমে গরমে থাকবি, বুঝলি?'

লালি কান খাড়া ক'রে চেয়ে চেয়ে সবই শুনেছে, তারপর বলা নেই কওয়া নেই কষে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আচ্ছা ক'রে কুসুমের পা চেটে দিয়েছে।

রান্না শেষ করলেন মহামায়া। ঘরে গিয়ে একবার ঘড়ির দিকে

তাকিয়ে এসে বললেন, 'যা যা, এবার চটপট স্নান ক'রে মাথা-টাথা আঁচড়ে ফিটফাট হ'য়ে থাক।' বলেই আবার কী মনে পড়লো, কড়াই বসিয়ে দিলেন উনুনে। সব কিছু গুছিয়ে রেখে ঘর পরিষ্কার করতে করতে কুসুম বললো, 'আচ্ছা মা, তুমি জাত মানো?' মহামায়া দ্রুতহাতে ফোড়ন ছাড়লেন গরম তেলে, চিড়বিড় ক'রে উঠলো। কাঁচা আমের অম্বল করছেন তিনি, সেগুলো ছেড়ে দিয়ে সাঁতলে জল ঢালতে ঢালতে বললেন, 'এ আবার কী কথা?' কুসুম বললো, 'তাহ'লে আমি রেঁধে দিলে তুমি খাও না কেন?'

'বিধবাদের যে স্বপাক খেতে হয়।'

'দাদাবাবুর বৌ এলে তার হাতেও কি খাবে না?'

শক্ত প্রশ্ন। ছেলের বৌর হাতে শাশুড়ি খাবে এটাও যে কারো জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে ভাবেননি আগে। কিন্তু তিনি যদি কুসুমের হাতেই না খান তাহ'লে কী যুক্তিতে বৌর হাতে খাবেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কবে দাদাবাবু বিয়ে করবে, কবে দাদাবাবুর বৌ এসে রান্না করবে, এখন আমি সে সব ভাবি বসে, না?'

'বুড়ো তো হবে? তখন তো রাঁধতে পারবে না।'

'একজন ঠাকুর রেখে নেবো।'

'তার মানেই তুমি জাত মানো।'

আজকাল কুসুমের কাছে কথায় কথায় ঠকে যান মহামায়া। হেসে বললেন, 'আচ্ছা যুক্তিবাদী হয়েছিস তো।'

'কেন হবো না। এদিকে বলবে আমি তোমার মেয়ে, ওদিকে রান্নার বেলায় ঠাকুর।'

'তুই এখনো যথেষ্ট ছোট, রান্না করতে গেলে হাত পুড়ে যাবে তোর।'

'ওসব তোমার চালাকি। শোনো, কাল থেকে আমি রাঁধবো।'

'রাঁধিস।'

'অবিশ্যি দাদাবাবুর রান্না রাঁধতে আমার ভয়ই করবে, তোমারটা রেঁধে দিতে পারবো।'

'দাদাবাবুরটা ভয় করবে কেন ?'

'তোমার ছেলে আমার রান্না পছন্দই করবে না।'

'তুই জানিস !'

'জানি।'

'দেখিস, সে কতো ভালো।'

'আচ্ছা মা, আজ তোমার খুব আনন্দ, না ?'

'ক'দিন পরে আসছে, আনন্দ হবে না ?'

'দাদাবাবুকে তুমি খুব ভালোবাসো, না ?'

'বাসবো না ! দাদাবাবু ছাড়া আর কে আছে আমার।'

'কেউ নেই ?'

'কেউ নেই '

'কেউ-ই নেই ? আর কেউ-ই তোমাকে দাদাবাবুর সমান ভালোবাসে না ?'

এতোক্ষণে কুসুমের কথার মর্মার্থটা গ্রহণ ক'রে মহামায়া তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বললেন, 'আর আছিস তুই।'

'আমার কথা আর বলছো কেন।' কুসুমের মুখ ভার হ'য়ে ওঠে।

'কেন বলবো না', মহামায়া সস্নেহে হাসলেন, 'তুই কি আমার কম নাকি ?'

'দাদাবাবুর মতো তো আর না।'

'বাঃ, দাদাবাবু তোর বড়ো না ? সে এসেছে কতো আগে, আর তুই তো এই সেদিন।'

'তার জন্যে নয়।'

'তবে কি জন্যে ?'

'দাদাবাবু তোমার পেটের ছেলে বলে।'

'তুই তো বুকের মেয়ে। কম কী। কিন্তু এবার ওঠ তো, শীগ্‌গির চান ক'রে আয়। দেখবি এক্ষুণি এসে যাবে সে।'

উঠলো কুসুম। যত্ন ক'রে স্নান করতে আজ খুব ভালো লাগলো তার। কেউ বাড়িতে আসবে, আর তার উপলক্ষ্যে এমন উত্তরোল

হ'য়ে ওঠা, মনের এ স্বাদ তার নতুন। রোজ রোজ একটা একটা আলোর দরজা, সুখের দরজা খুলে যাচ্ছে জীবনে। সে অনুভব করলো, না-দেখা দাদাবাবুটির জন্য কেমন এক রকমের মমতা জন্মেছে তার।

আজ মহামায়া তাকে নিজে শাড়ি পছন্দ ক'রে দিয়েছেন পরতে। নীল রংয়ের শাড়ি। সেই শাড়ি পরে নিজের ঘরে গিয়ে মাথায় চিরুণি বুলোতে না বুলোতেই সাইকেল-রিক্সার বেল বেজে উঠলো ফটকে, সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার শিক্ষা সহবৎ সব ভুলে সে চেঁচিয়ে উঠলো 'এসে গেছেন, এসে গেছেন।' বলতে বলতে দৌড়ে সে ছুটে এলো নিচে, তারপর একেবারে ফটকে। আর ফটকে এসেই বুঝতে পারলো কাজটা অন্যায় হয়েছে; অপরাধ হয়েছে, এই ব্যবহার অশোভন। লজ্জা পেলো, কিন্তু একরাশ উদ্দাম কৌতূহলের ঝোঁকে প্রায় কাঁপতে লাগলো বুকটা।

॥ ২৫ ॥

রিক্সা থেকে নামলো সোমেন, মহামায়া এসে বাগ্রহাতে জড়িয়ে ধরলেন। নিবারণ দৌড়ে এলো, ছোটু সিং অন্য রিক্সা থেকে স্যুটকেসটা নামিয়ে নিলো, মুহূর্তে বাড়িটা সরগরম হ'য়ে উঠলো। তার মধ্যে নিবারণের হাঁকডাকটাই সবচেয়ে বেশী। সোমেন মা'র সঙ্গে বারান্দায় উঠলো এসে।

কুসুম বুঝলো, এই মিলনের দৃশ্যে তার কোনো পার্ট নেই, তাকে কেউ চেনে না, সে কেউ নয়। যে লোকটির কথা ভেবে ভেবে ক'দিন সমানে এতো উত্তেজিত হ'য়ে রয়েছে, সবটা তার নিজের কল্পনা। শুনে শুনে এই বাড়ির সোমেন নামের ছেলেটিকে সে মুখস্থ ক'রে ফেলেছে বটে, কিন্তু সোমেন তাকে চেনে না। সোমেনের কাছে তার কোনো মূল্য নেই।

চুপ ক'রে চোরের মতো সেই ফটকের ধারেই দাঁড়িয়ে থাকলো সে, অনেকক্ষণ তাকে কেউ ডাকলো না। খোঁজ করলো না। হঠাৎ

কেমন ফাঁকা লাগলো বুকটা।

বিশ্রাম করতে করতে গল্প করতে করতে সোমেন বললো, 'ঐ মেয়েটিই তোমার কুসুম, না ?'

'ও মা তাই তো, কোথায় সে', এতাক্ষণে খেয়াল হ'লো মহামায়ার, 'কোথায় দেখলি ? কখন দেখলি ?'

'ঐ তো গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলো '

'কুসুম। কুসুম।' ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন তিনি। 'কোথায় গেলি, নিবারণ, কুসুমকে ডাক তো !'

পাশের ঘর থেকে হাতে ধ'রে তাকে নিয়ে এলো নিবারণ, 'আসতে চায় না বৌমা, দিদিমণির আবার লজ্জা হয়েছে।'

'আয়, আয়, কতো তো ছটফট করছিলি দাদাবাবুর জন্য, এখন বুঝি লজ্জা ? সমু, এই আমার কুসুম।'

কুসুম মুখ ফিরিয়ে শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মন থেকে মায়ের উপর অভিমানের কালো পর্দাটা কিছুতেই সরে যাচ্ছে না তার। মহামায়া কাছে টেনে আনলেন, 'প্রণাম কর দাদাবাবুকে।'

লম্বা চুল এলিয়ে নীচু হ'লো কুসুম, সঙ্গে সঙ্গে তিন পা পিছিয়ে গেল সোমেন, 'ও কি, ছি।' মহামায়া বললেন, 'ছি কী রে, তুই তো ওর দাদা, নিশ্চয়ই প্রণাম নিবি'

সোমেন বুঝলো এগুলো মা'র সম্পর্কটাকে ঘনিষ্ঠ ক'রে মন ভোলাবার গোপন কৌশল। ভেবেই আবার তার রাগ চড়ে উঠলো, বিরক্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি স্নানে চলে গেল। সেই বিরক্ত মুখ মহামায়ার চোখ এড়ালো না, তিনি থমকালেন। মনটা ভারি হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু সে মেঘ ক্ষণিক। তখুনি আবার ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন পরিচর্যার তদারকে। তাড়াতাড়ি খাবার ঠিক করতে বসলেন।

বেলা বেড়েছে অনেক, বাদাম গাছের ছায়া অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছে, খেতে না পেয়ে অস্থির হ য়ে উঠেছে কুসুমের কুকুর।

নিবারণ সব গরম ক'রে এনে দিলো, মহামায়া নিজেই পরিবেশন

করলেন, এর মধ্যেও কুসুমের কোনো পার্ট রইলো না।

ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে উপরে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে তারপর তিনি খেতে বসলেন কুসুমকে নিয়ে। কুসুমের বিমর্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন একটু, 'কি রে, কথা নেই যে, খিদে পেয়েছে খুব, না ?'

'না।'

'তবে ? মুখ ভার কেন ?'

মনের ভাব লুকোতে শেখেনি কুসুম, মায়ের এতোক্ষণের অবহেলার পরের এইটুকু আদরেই প্রায় তার চোখে জল এসে গেল। ভাবি গলায় বললো, 'ছেলেকে পেয়ে তুমি সব ভুলে গিয়েছ।

'দূর বোকা।'

'কিন্তু তোমার ছেলে মোটেই তোমার মতো নয়।'

'কী রকম ?'

'অন্যরকম।'

'চেহারায় ? না স্বভাবে ?'

'স্বভাবে।'

'আর দেখতে ?'

'বলবো না।'

'কেন ?'

'দেখতে ভালো হ'লেও আমার পছন্দ হয়নি।'

'হয়নি ?'

'না।'

'তবে ?'

'কী তবে ?'

'ভাব হবে কী ক'রে ?'

'আমি ভাব চাই না।'

'কলকাতাও যাবি না!'

'না।'

'এতো রেগে গেছিস ?'

'রাগ কেন ?'

'তবে ?'

'আমি এ বাড়ির কে ? তুমি দাদাবাবুরই শুধু মা, আমার নও।'

মহামায়া শব্দ ক'রে হাসলেন, 'আমার উপরও রাগ ক'রে থাকবি নাকি ?'

নিবারণ বললো, 'তা বাপু করতেই পারে, তুমি আজ ছেলেকে পেয়ে কুসুমকে কিন্তু আর চোখেই দেখনি।'

॥ ২৬ ॥

খাওয়াদাওয়া সাঙ্গ হ'তে হ'তে বেলা শেষ হ'লো। মহামায়া বললেন, 'একটা কাজ করবি কুসুম ?'

'কী।'

'দাদাবাবুকে এক কাপ চা ক'রে দিয়ে আসবি উপরে ?'

'আমি !' কুসুমের প্রায় চোখ খাড়া।

'তুই একটা বড়ো মেয়ে বাড়িতে থাকতে কি তবে আমি নিয়ে যাবো ?'

'নিবারণদা নিয়ে যাবে।'

'নিবারণদাই বা কেন নেবে ? বুড়ো মানুষ।'

'আমি পারবো না।'

'কেন ?'

'না, না—'

'বোকা মেয়ে, হাজার হোক দাদা তো, তাকে খুশি করা তোর উচিত কিনা বল ?'

'না না, খুশি হবেন না, রেগে যাবেন।'

'চা নিয়ে যা না, দেখিস চা পেলেই মেজাজ অন্য রকম হবে। কথা বলবে।'

একটু চিন্তিত দেখালো কুসুমকে, 'আচ্ছা মা—'

'কী।'

'ঐ গেটের কাছে ও-রকম দৌড়ে যাওয়াটা খুব বিচ্ছিরি হয়েছে, না? দাদাবাবু নেমে প্রথমেই আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, তোমাকে দেখবার আগে। আর তখন থেকেই রেগে গেছেন।'

'রাগ না বোকা, লজ্জা। চেনে না তো। চা নিয়ে যা, দেখবি চেনা হ'য়ে যাবে।'

'গিয়ে কী বলবো?'

'বলবি, এই যে আপনার চা।'

'আপনি বলবো?'

'বলবি না!'

'তখন দাদাবাবু কী বলবেন?

'তুই আগে নিয়েই যা, না গ্যাখ না কী বলে?'

অতএব কুসুম চা ক'রে উপরে নিয়ে এলো। কিন্তু ঘরে ঢুকতে ভারি ভয় করলো তার। পর্দার ফাঁকে প্রথমে উঁকি মেরে দেখতে গিয়েছিলো, দরজাটা ঠক ক'রে উঠলো। বিছানায় গা এলিয়ে সিগারেট টানছিলো সোমেন, মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলো। কেঁপে উঠে ঘরে ঢুকে কুসুম বললো, 'আপনার চা।'

গম্ভীর হ'য়ে সোমেন বললো. 'ঠিক আছে, রেখে যাও।'

বলা মাত্রই রাখতে যাচ্ছিলো, কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে মাথার কাছে রেখে যেতে পারে এ-রকম কোনো টেবিল দেখতে পেলো না সে। সাহস সঞ্চয় ক'রে বললো, 'কোথায় রাখবো?

'যেখানে হয়।'

ভুরু কুঁচকোলো কুসুম। দূরের লেখাপড়ার টেবিলে ঠক ক'রে কাপটা বসিয়ে রেখে চলে যেতে-যেতে রাগী গলায় বললো, 'ঠাণ্ডা হ'লে আমি জানি না।'

একটু অবহিত হলো সোমেন। সে জানতো না এ-বাড়িতে মহামায়া কুসুমকেও প্রায় তার সমান-সমান অধিকারের আসনেই

বসিয়ে রেখেছেন। আহত করলে সে-ও ভয়ের বদলে প্রতিবাদের সুব ফোটায়। উঠে বসলো সে, পা নাড়ালো, বুঝতে পারলো শিকড় গভীরে গেছে, উৎপাটিত করতে সময় লাগবে। কিন্তু 'এ আমি উপড়ে দেবোই,' মনে মনে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো, যেন মা'র সঙ্গে ঝগড়া কবলো। তারপর চায়ে চুমুক দিলো।

দুপদাপ শব্দে কুসুমকে নামতে দেখেই মহামায়া কুসুমের রাগটা টেব পেলেন। বিকেলের জন্য জলখাবারেব আয়োজন করছিলেন, না-তাকিয়েই বললেন, 'কী রে বাড়িঘড ভেঙে ফেলবি নাকি ?'

কুসুমেব ফর্সা মুখ লাল দেখালো, গুম হয়ে মহামায়ার পিঠের কাছে বসলো সে, বললো, 'তুমি ওঠো. উপরে যাও।'

'আব এই সব ?'

'আমি করবো '

'দাদাবাবু কী করছে ?'

'জানবো কী ক'রে ?'

'বা, চা দিয়ে এলি, আব জানিস না ?'

'অ'ব আমি কখনো কিছু নিয়ে যাবো না।'

'কেন ?'

জোবে-জোবে ময়দা চটকাতে লাগলো কুসুম, জবাব দিলো না।

'শাড়িটা ও-বকম গেছো মেয়েব মতো পড়েছিস কেন ?'

'ও-বকম পবতেই আমার ভালো লাগে।'

'ভালো লাগতে পারে, কিন্তু ভালো দেখায় না। আঁচলটা কোমব থেকে খোল।'

উঠে দাঁড়িয়ে কুসুম আঁচল খুললো, তারপর আবার নিঃশব্দে ময়দা মাখতে লাগলো।

কুসুমের আপত্তি না-মেনে বিকেলের চা জলখাবারও মহামায়া কুসুমকে দিয়েই পরিবেশন করালেন, কিন্তু ছেলের মুখের দিকে

তাকিয়ে কোথায় যেন একটা ভয়ানক জেদের চেহারা দেখতে পেলেন।

কিন্তু তবু তিনি বিরত হলেন না, পরের দিন সকালেও আবার কুসুমকে দিয়েই চা পাঠালেন। এই চা তার বিছানায় শুয়ে চুমুক দেবার। নিবারণ এসে মশারি তুলে, জানালা খুলে দিয়ে গেল, তারপরে চা নিয়ে এলো কুসুম। মহামায়া বলে দিলেন, 'যদি দেখিস ঘুমিয়ে আছে, দাদা বলে ডাকবি।'

'ডাকবো?'

'না-ডাকলে সম্পর্ক হয়? না কি না-ডেকে চা দিয়ে এলে লোকে টের পায় তার চা এসেছে?'

রাগ-রাগ পায়ে অগত্যা আবার চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো কুসুম। এক ফালি রোদ এসে খাটের বাজুতে আলপনা কেটেছে, দুটো চড়ুই কী যেন খুঁজছে টেবিলের উপরে, সোমেন ঘুমুচ্ছে।

এই সুযোগে সে ভালো ক'রে দেখে নিলো তার প্রতিপক্ষকে। কুসুম ঠিক বুঝেছে এই ব্যক্তিই এ-বাড়িতে তার সবচেয়ে বড়ো প্রতিযোগী। এর ইচ্ছার উত্থানপতনেই এ-বাড়ির প্রত্যেকটি প্রাণী ওঠে নামে।

টেবিলে একটু শব্দ করলো সে। না, মা যতোই বলুন, এমন শত্তুরকে কোনোক্রমেই সে সেধে-যেচে দাদা বলে ডাকতে পারবে না। কাল থেকে কী দাদার মতো ব্যবহার করেছেন ইনি?

সোমেন চোখ খুললো না।

এইবার সে কাশলো। আর কেশেই লক্ষ করলো সোমেনের পা নড়ছে। সঙ্গে-সঙ্গে সব সাহস নিমেষে অন্তর্হিত হ'লো তার।

সোমেন চোখ না খুলেই বললো, 'কী চাই?'

'চা এনেছি যে।'

'বেশ তো, রেখে যাও না।' বলেই চোখ খুলে তাকালো সে, হাত বাড়িয়ে বললো, 'দাও।' তারপর বললো, 'কেউ ঘুমিয়ে থাকলে ঘরে ঢুকতে হয় না।'

চা দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেল কুসুম।

মহামায়া বাজারের ফর্দ দিচ্ছিলেন, বললেন, 'কী রে, দাদার ঘুম ভেঙেছে ?'

'দাদা ? তোমার ছেলে আমার দাদা না।'

'কী তবে ?'

'কী আবার। কেউ না।'

'আমি মা হ'লে আমার ছেলে তোর দাদা হবে না ?'

'না।'

'আর-একটা কাজ করবি ?'

'কী।'

'গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে আসবি চায়ের সঙ্গে ডিম রুটি ছাড়া আর কিছু খাবে কিনা।'

'না, মা, না---'

'শোন', কুসুমকে কাছে টেনে নিলেন তিনি, 'রাগ করিস না, ঐ একদিন দু'দিনই ও-রকম করবে, তারপর দেখবি কতো ভালোবাসবে, কলকাতা নিয়ে যাবে, লেখাপড়া শেখাবে—তুই একটু লক্ষ্মী মেয়ের মতো কাছে-কাছে ঘুরবি, এটা দিবি ওটা দিবি, কথা বলবি মন জোগাবি—

বেচারা কুসুম! অগত্যা তাকে আবার আসতে হ'লো। কিন্তু ঘরে ঢুকলো না। দরজায় দাঁড়িয়ে দেয়ালে তাকিয়ে বললো, 'আমি নিজে আসিনি, মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

'কেন ?'

'জিজ্ঞেস করেছেন চায়ের সঙ্গে কী খাওয়া হবে।'

'এ চা-টা কে করেছে ?'

'আমি।'

'এতো চিনি দিয়েছ কেন ? এটা চা না সরবৎ ? মাকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে।'

পর্দাটা মুঠোয় ধ'রে কুসুম সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো, বললো, 'মা বারে-বারে উপরে আসতে পারবেন না, সকালের কাজ সেরে তবে আসবেন। যা বলবার আমাকেই বলতে হবে।'

স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হ'লো সোমেন, আদেশের গলায় বললো, 'যা বলছি তাই শোনো।' তারপরেই সিগারেট ধরিয়ে উঠে পড়লো, 'ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।'

কুসুমকে পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে গেল সে। ছেলেকে দেখে মহামায়া তাকালেন, 'কী রে, উঠে পড়েছিস? মুখ-হাত ধুয়ে আয়, টোস্ট আর ডিম ছাড়া আর-কিছু খাবি নাকি বল।'

'দয়া ক'রে এ চা-টাই একটু ভালো ক'রে দাও।'

ছেলের মেজাজ দেখে মহামায়া একটু হকচকিয়ে গেলেন। আস্তে বললেন, 'কেন, কী হয়েছে?'

'চায়ের বদলে তো আর চিনির সরবৎ খাওয়া যায় না।'

নিবারণ ডেকে উঠলো, 'ও কুসুম, অত মিঠা দিয়েছ কেন দাদাবাবুর চায়ে? এসো, আর এক কাপ ক'রে দেবে। আমি বাজারে যাচ্ছি।' উপরের বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে কুসুম জবাব দিলো, 'আমার চা ভালো হয় না নিবারণদা।'

মহামায়া হেসে মন গলাতে চাইলেন ছেলের, 'বড্ড ছেলেমানুষ! তুই একটু ডেকে কথা-টথা বল। ক'দিন থেকে একেবারে দাদা-দাদা করে অস্থির।'

সোমেন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনের লিপিটির পাঠোদ্ধার করতে চেষ্টা করলো। এ-বাড়িতে মেয়েটির যে ঠিক এই রকম জায়গায় স্থান হ'য়েছে এতোটা সে ভেবে আসেনি। মেয়েটির চলন বলন চেহারা বিষয়েও তার এই ধারণা ছিলো না। যদি পরিচয় জানা না-থাকতো সোমেন মনে করতো তার নিজেরই কোনো অপরিচিত আত্মীয়া। আস্তে বললো, 'মেয়েটি এ-জন্যই তোমার কাছ থেকে যেতে চায় না।'

'কী জন্যে?'

'এই সুখ, এই প্রশ্রয়।'

'সুখের কথা থাক। কিন্তু প্রশ্রয়ের কী দেখলি তুই?'

'চা-টা বদলে দাও।'

'কথাটার জবাব দিবি তো?'

'কী কথা?'

'প্রশ্রয় শব্দটা ব্যবহার করলি কেন?'

'সব তো আমি তোমাকে চিঠিতেই লিখেছি। আমি এখনো বলছি, এ-সব দায়িত্ব তুমি নিতে যেয়ো না, সারা জীবন তোমাকেই বইতে হবে।'

'তা নিয়ে আর এখন আমি তোর সঙ্গে তর্ক করবো না। ওটা তোলা থাক অন্য সময়ের জন্য। শুধু একটা কথা।' বোঝা গেল একটু উষ্ণ হয়েছেন মহামায়া, 'কেবল নিজের নিরাপত্তা নিয়েই অত ভাবিস না, সংসার পাঁচজনকে নিয়ে, মানুষই মানুষের আশ্রয়।'

'তুমি রাগ করবে জানতাম।'

'রাগ করবো কেন, জীবন ভ'রে এই আমি সত্য বলে জেনে এসেছি।' সেই প্রসঙ্গে ছেদ টেনে দিয়ে সিঁড়ির উপরের দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় ডাকলেন, 'কুসুম।'

'মা।' উপর থেকেই জবাব এলো।

'কী করছিস?'

'বিছানা তুলছি।'

'আগে দাদাবাবুকে চা ক'রে দিয়ে যা। নিবারণ বাজারে গেছে।'

কুসুম নেমে এলো। সোমেনের হাতের কাছ থেকে তুলে নিল কাপটা। রান্নাঘরে যেতে-যেতে বললো, 'জানোই তো, আমার করা চা পছন্দ হবে না, তবু তুমি আমাকেই করতে বলবে।'

মহামায়া গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'তোকে করতে হবে না, তুই জল ফুটিয়ে নিয়ে আয়, আমি এখানে ছোটো পটে ক'রে দেবো।'

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে খুশি করার জন্য সোমেন বললো, 'না, না, পটে করতে হবে না, ও-ই ক'রে নিয়ে আসুক। শুধু

বলে দাও চিনি যেন একটু কম দেয়।'

জল ফুটিয়ে আবার চা ক'রে নিয়ে এলো কুসুম। মুখে না-দিয়েই সোমেন বললো, 'চমৎকার হয়েছে।' তারপর মায়েব দিকে আড়চোখে তাকিয়ে উঠে গেল সেখান থেকে।

॥ ২৭ ॥

লম্বা ছুটি, গ্রীষ্মের দীর্ঘ বেলা, আরামে আয়াসে আলস্যে যত্নে কোথা দিয়ে যে কাটতে লাগলো দিনগুলো।

এর মধ্যে কুসুমকে নিয়ে আর কোনো কথা উঠলো না মা র সঙ্গে। সোমেনও উঠালো না, মহামায়াও এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু দু'জনের মনেই একটা চাপা উদ্বেগ খচখচ করতে লাগলো কাঁটাব মতো। মা আব ছেলের এই নিঃশব্দ বিরোধটা বেশ বুঝতে পারলো কুসুম। একটা সূক্ষ্ম বেদনার কাঁটা তার বুকের মধ্যেও খচখচ করলো। অনুভব করলো মাকে সুখী করতে হ'লে এই মানুষের সন্তোষভাজন হওয়াটা জরুরি। কিন্তু কী করলে তা হওয়া যায়, সে-বিদ্যা তার আয়ত্তে ছিলো না। আর সেই কারণেই কখনো-কখনো মানুষটির উপর রাগ হ'তো তার, শত্রু ভাবতো, কিন্তু সে-ভাবও স্থায়ী হতো না। আসলে সোমেনকে তার ভালো লাগছিলো। তার জগতে এই পুরুষ, পুরুষের এই অভিব্যক্তি অবিশ্বাস্য, অপ্রত্যাশিত। সোমেন তার সঙ্গে কখনো কথা বলেছে এটাও যেমন ঘটেনি, কখনো রূঢ় হয়েছে এমন ছবিও নেই। মানুষটি ধীরে চলে, ধীরে বলে, বাড়ির কর্তা তবু কর্তৃত্ব করে না, রাগ করলে চ্যাঁচায় না, খিদে পেলে মারতে আসে না। মায়ের সঙ্গে তার এমন মধুর, এমন নরম সম্পর্ক যে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে কুসুম, অবাক হ'য়ে ভাবে, পুরুষের কাছে তবে মেয়েদের এই পাওনাও আছে! মুগ্ধ না-হ'য়ে উপায় কী!'

সোমেন আসার পর থেকে কিছু কাজ বেড়েছে বাড়িটায়। রান্না-খাওয়া, সাজানো-গুছোনো, ফাইফরমাস—সব-কিছুতেই তার প্রমাণ মজুত। সারাদিন খাটছে কুসুম, হাজারো বার একতলা দোতলা

করছে, প্রতিটি কাজ নিজের হাতে করবার আগ্রহে ক্লান্ত হচ্ছে। যেটা না-করলেও চলে সেটা নিয়েও সে দশবার মাথা না-ঘামিয়ে পারছে না।

এই প্রাণান্ত সেবা-যত্ন ছাড়া আর কোনো ভাষা তার জানা নেই, যে-ভাষায় সে তার হৃদয়কে উন্মোচিত করতে পারে। এটাই তার একমাত্র অবলম্বন।

সেই সঙ্গে ভয়ে-ভয়ে দরজার পর্দা ধ'রে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ভাব জমাবার চেষ্টাও করে একটু-একটু। হঠাৎ-হঠাৎ অকারণেই এসে দাঁড়ায়, গোছানো টেবিল আবার গুছোয়, এইমাত্র চা দিয়েও জিজ্ঞেস করে, 'আর-এক কাপ কারো লাগবে নাকি?' অথবা 'বেলা বেড়েছে, স্নান ক'রে নিলে তো বেশ হয়।' এই করতে-করতে সাহসও বেড়েছে একটু। অ্যাশট্রের মধ্যে সিগারেটের টুকরোর সংখ্যা গুনতে-গুনতে বলে—সে শুনেছে যারা এতো বেশী খায় তাদের কলজে ফুটো হয়ে যায়। অথবা 'এতো চা খেলে খিদে থাকে না।' এটাও সে শুনিয়ে দিয়েছে, 'কেউ যদি তাকে কলকাতা নিয়ে যায়, কখনো সে দেশে ফিরতে চাইবে না; শুধু তাই নয়, সেখানে গিয়ে সে প্রচণ্ড পরিমাণে লেখাপড়া করবে, লেখাপড়া শিখে চাকরি করবে।'

বই পড়তে পড়তে মাঝে-মাঝে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে সোমেন, তারপর আবার বই পড়েছে। তার নিজেরই অজান্তে তার মুখের চেষ্টাকৃত কঠোর রেখাগুলো কখন কোমল হ'য়ে এসেছে।

এর মধ্যেই এক লম্বা চিঠি এলো সমীরের। প্রথমে বাড়ির বিষয়ে লিখেছে। সোমেনের নতুন অনুমতির অপেক্ষা না-রেখেই চলে গেছে তারা সেখানে। তাড়াতাড়ি না-গেলে পাওয়া যেতো না। আর গিয়ে দেখছে, বাড়িটা সত্যি ভালো, সত্যি হাত-পা-ছড়ানো। কৃষ্ণা আর শর্মিষ্ঠা এর মধ্যেই চমৎকার সাজিয়ে-গুছিয়ে বসেছে। সোমেনের দিকে দু'খানা ঘর আর তাদের নিজেদের দিকে তিনখানা, এই ভাবে ভাগ করেছে বাড়িটা। মস্ত লম্বা ঢাকা-বারান্দার ভাগও ঠিক এই

ভাবে হয়েছে, সোমেনের অংশ তিন ভাগের এক ভাগ, দু' ভাগ তাদের। তার কারণ—শর্মিষ্ঠাও থাকছে তাদের সঙ্গে এবং সেই অনুপাতে বাড়িভাড়াও তিনভাগ হচ্ছে। এবং সেটা শর্মিষ্ঠারই নির্দেশ। ফলত সোমেনের দিক থেকে বাড়ির জন্য খুব কষ্ট ক'রে মাশুল গুনতে হবে না। আর অসুবিধেও কিছু নেই, সোমেন আর তার মা এই তো দু'জন মানুষ, চমৎকার কুলিয়ে যাবে। ছোট্ট একটু মাটির উঠোন আছে, কৃষ্ণা তার এক কোণে সোমেনের মা'র জন্য তুলসীগাছ পুঁতে সাংঘাতিক জল দিচ্ছে, আর শর্মিষ্ঠা মাটি খুঁড়ে বাগান করার চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম।

এই অবস্থায় সোমেন না-এলে জমছে না। তা ব্যতীত মহিলা দু'জনের মুখে কানু বিনে গীত নেই। যেন সোমেন ছাড়া বাড়িতে অন্য কোনো পুরুষ নেই, হিংসায় তার দেশান্তরী হ'তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বর্তমানে দেশান্তরী হবার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছে না সে, কেননা মহিলা দু'জনের ইচ্ছে, তাকে কাণ্ডারী ক'রে তাঁরা একবার কাঞ্চনপুরে পাড়ি দেন।

সেদিন দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ হ'য়ে যাবার পরে মা'র সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলতে উদ্যোগী হ'লো সে। মহামায়া শুয়েছিলেন একটু, সোমেন কাছে এসে বসলো।

চোখ ফিরিয়ে মহামায়া বললেন, 'কী রে?'

'সেই কথাটা।'

'কী কথা?'

'কলকাতার বাড়ি নেয়া হ'য়ে গেছে।'

'হ'য়ে গেছে!' উঠে বসলেন মহামায়া।

'হ্যাঁ, সমীর লিখেছে ওরা চলে গেছে সে-বাড়িতে।'

'চলে গেছে!'

'তাতে অবাক হচ্ছো কেন? বরাবরই তো তাই ঠিক ছিলো।'

'কিন্তু বাড়ি তো তারা তোর ভরসাতেই নিয়েছে।'

'তা না-হ'লে অত ভাড়া ও একা কী ক'রে দেবে।'

'কিন্তু—'

'এখনো তোমার কিন্তু?'

'তুই তো সবই জানিস, সমু।'

'না, আমি কিছু জানি না, জানবার কিছু দেখছিও না।'

'দেখছিস না?'

'না।'

খোলা জানালা দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেব রোদটা এসে মহামায়ার মুখে পড়লো। হাতের ঠেলায় কপাট ছুটো বন্ধ ক'রে দিয়ে বললেন, 'তুই অবশ্য কুসুমের কথাটা ভাবছিস না, কিন্তু আমার একটা দায়িত্ব আছে।'

সোমেন চুপ ক'রে রইলো।

মহামায়াও চুপ ক'রে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, বললেন, 'ওর কোনো ভালো বন্দোবস্ত না-করা পর্যন্ত আমার পক্ষে এ-ভাবে চলে যাওয়া সম্ভব নয়।'

গম্ভীব গলায় সোমেন বললো, 'বন্দোবস্ত করতে তো অনেক আগেই লিখেছিলাম।'

'তুই যে বন্দোবস্ত ক'রে সব দায় ঝেড়ে ফেলতে চাস, আমি তো তা পাবি না। জেনে-শুনে ভাসিয়ে দিতে পারি না মেয়েটাকে।'

'নিজের বাড়িতে যাওয়া কি ভেসে যাওয়া?'

'তোকে সবই বলেছি, তারপরেও তুই এ-কথা বলিস?'

'তা বেশ তো, ওকেও নিয়ে চলো, আমি তো বারণ করিনি।'

'আমার দায় তোর ঘাড়ে চাপাবো কেন?'

'তোমার দায় আর আমার দায় কি আলাদা নাকি?'

'আলাদা বৈকি। মানুষ আলাদা হ'লে তার কর্মও আলাদা হয়।'

'তা হ'লে তুমি কলকাতা যাবে না?'

'না—মানে—আমি বলছিলাম—'

'ঘুরিয়ে কথা বোলো না, হ্যাঁ কি না বলে দাও।'

ছেলের বিরক্তির জবাবে মহামায়াও ঈষৎ উষ্ণ হলেন; বললেন, 'ঘুরিয়ে বলার কিছু নেই। ওর ব্যবস্থা করতে পারলেই আমার যাবার কথা উঠবে।'

'তার মানে, আমি যেখানেই পড়ে থাকি, যে-ভাবেই থাকি না কেন, তার চাইতে ওকে নিয়ে থাকাটাই তোমার কাছে সবচেয়ে বড়ো কথা, এই তো?'

'না।'

'তবে?'

'খুব ভালো ক'রে জানিস তোকে ছেড়ে থাকার দুঃখের কাছে আর কিছুই আমার কিছু নয়।'

'অন্তত এখন তার কোনো প্রমাণ তুমি দিচ্ছ না।'

'সমু, আমার মনে ব্যথা দেবার জন্যই তুই কেবল কঠিন কথা বলছিস। তুই নিজেই কি আজ আর ওকে তাড়িয়ে দিতে পারিস?'

'কী আশ্চর্য! তা কেন বলবো? আমি তো ওকে নিয়েই যেতে বলছি। তবে যাবার আগে ওর স্বামীর খোঁজ-খবর ক'রে ডেকে এনে কী ব্যাপার, কী বৃত্তান্ত সবটা জেনে নেয়া দরকার, তারপর সে যদি রাজী থাকে—'

মহামায়া সবেগে মাথা নাড়লেন, 'তা আমি পারবো না। কে ওর স্বামী, কোথায় থাকে, আর ঐরকম একটা অসৎ লোক—'

'সবই তো তোমার এক মুখে শোনা।'

'দুই মুখ দিয়ে আমার দরকার কী? আমি ওকে অবিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু বিয়েটা তো আর অস্বীকার করতে পারো না?'

'কেন পারবো না! আমি ভেবেই নিয়েছি আমি ছাড়া ওর কেউ নেই। যদি কলকাতা নিয়েই যাই ওর সব অতীতকে অস্বীকার ক'রেই নিয়ে যাবো।'

'তারপর?'

'লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে তুলবো, তারপর ইচ্ছে হ'লে বা

মতোমতো কাউকে পেলে বিয়ে করবে অথবা করবে না, আমি তা নিয়ে কোনো সংস্কার মনে রাখবো না। মানুষে গড়া সম্পর্কের চেয়ে ভগবানে গড়া প্রাণের অনেক বেশী মূল্য। শেষ পর্যন্ত তো সবই মানুষের ভাগ্য।'

'ভাগ্যটা অবশ্য ভালোই।' একটু হাসলো সোমেন।

ছেলের কথায় আহত হ'য়ে মহামায়া বললেন, 'আর যাই করিস, কুসুমের ভাগ্য নিয়ে অন্তত পরিহাস করিস না।'

'বা রে, তা কেন করবো। তবে তোমাকে যে মা বলে পেয়েছে তাকে হতভাগ্য বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সে তুমি রাগই করো আর যা-ই করো।'

একটা কথা শোন।'

'বলো।'

কোনোদিন তো ডেকে দুটো কথা বলিসনি মেয়েটার সঙ্গে, আজ তুই নিজেই ওকে ডেকে জিজ্ঞেস কর না ওর বাড়ি-ঘরের কথা।'

'তাতে কী লাভ হবে?'

'মানুষটাকে বুঝতে পারবি। কী ভাবে ছিলো, কেন এমন ক'রে পালিয়ে এসেছে—'

'সে তো তোমার কাছেই সব শুনেছি।'

'পরের মুখে ঝাল খাবি কেন?'

'মা কি পর নাকি?'

'আমি হয়তো ওর সম্পর্কে দুর্বল, হয়তো যতোটা নয় ততোটা ভেবে শঙ্কিত হই; তুই তৃতীয় ব্যক্তির মন নিয়ে কথা বলে ছাখ না, কী মনে হয়। কুসুমের মতো মেয়েকে বুঝতে তো তোর আর এক হাঁড়ি ভাত টিপতে হবে না।'

'কিচ্ছু দরকার নেই।'

'আছে। এইমাত্র তুই বললি এক পক্ষের কথা শুনে কোনো সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। তার মানেই এই, এমনও হ'তে পারে যে কুসুম ওর স্বামী সম্পর্কে যা বলছে তা সত্য নয়।'

'না, না, তা বলিনি—'

'ঠিক তাই বলেছিস। মুখোমুখি কথা বললেই—কোনটা ওর সত্য কোনটা বানানো নিশ্চয়ই ধ'রে ফেলতে পারবি।'

'কিচ্ছু দরকার নেই।'

'আছে। আমি বলছি আছে। যার ভার সারা জীবনের জন্য নিতে যাচ্ছিস, তার বিষয়ে কোনো সংশয় রাখা কোনো রকমেই উচিত নয়। ওতে ক্ষতি হবে। তুই ওর সঙ্গে নিজে কথা বলে যদি মনে করিস কোনো মেকি নেই, তা হ'লেই ওর কলকাতা যাওয়া বিষয়ে মনস্থির করা সহজ হবে।'

'ওর সঙ্গে কী বলবো!'

'কী আবার। জিজ্ঞেস করবি সব।'

'বলছি তো কিছু দরকার নেই।' সোমেন অসহিষ্ণু হ'লো। মহামায়াও জেদ ছাড়লেন না, ছেলের সুরে সুর মিলিয়ে বললেন, 'বলছি তো, আছে।'

'অবুঝের মতো করছো কেন?'

'তুইই বা এড়িয়ে যাচ্ছিস কেন?'

'ও-সব আমার ভালো লাগে না।'

'কেন, ও কি একটা মানুষ নয় নাকি যে ডেকে দুটো কথা বলতে পারিস না?'

উঠে দাঁড়ালো সোমেন, যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললো, 'চললাম, যা ঠিক করো আজই জানিয়ে দিয়ো, কালকের ডাকে সমীরকে চিঠি লিখে দেবো।'

দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকলো কুসুম। উৎসাহে উত্তেজনায় টগবগ করতে-করতে এসে থমকে গেল সোমেনকে দেখে। এই সময়ে মা'র ঘরে দাদাবাবুকে দেখবে, এটা সে আশা করেনি। তা বলে সে নিবৃত্ত হ'লো না। মহামায়ার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, চোখ বড়ো ক'রে গলা খাটো ক'রে বললো, 'জানো মা, বাঁধের ধারে মেলা বসেছে।'

মহামায়া বললেন, 'কে বললো?'

'নিবারণদা। এবারকার মেলা নাকি সব বারের চেয়ে ভালো।'

'বেশ তো।'

'নট্ট কোম্পানির যাত্রা বসেছে, পুতুলনাচ এসেছে, তারপর গিয়ে তোমার নাগরদোলা, বাউলের গান, কলকাতার সিনেমা—'

মহামায়া খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন, সোমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এইবার তুই ওর সঙ্গে কথা বলে মনস্থির কর।'

কুসুম চকিত হ'লো। একটা আসন্ন মেঘের ছায়া দেখলো সে। মহামায়া তার দিকে তাকালেন এবার, একটু তাকিয়ে রইলেন, গম্ভীব গলায় বললেন, 'শোন কুসুম, এখানে চুপ ক'রে বোস। দাদাবাবু যা-যা জিজ্ঞেস করবেন, ঠিক-ঠিক জবাব দে।'

কুসুমের বুকেব ভেতরটা পায়রার বুকেব মতো কাঁপতে লাগলো। ঢোঁক গিলে বললো, 'তুমি?'

'আমি কী?'

'তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

'নিচে।'

'আমিও নিচে যাবো।'

'এখন না। কথা শেষ হ'লে তবে যাবি।'

'কিন্তু আমি যে এখন গাছে জল দেবো।'

'যা বলছি তাই শোন', এই প্রথম কুসুমকে ধমক দিলেন মহামায়া। কুসুম তার সজল চোখ মাটিতে নিবদ্ধ ক'রে ক্ষুব্ধ হ'লো। তার বুঝতে বাকী রইলো না, যা হবার আজই হ'য়ে যাবে। এই দাদাবাবু, তার প্রত্যক্ষ শত্রু আজ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। ভিতরে-ভিতরে তাব অসহায় শিশু-মনটা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো।

সোমেন ব্যস্ত হ'য়ে বললো, 'না, না, আমার কিছু বলবার নেই। তুমি কোথায় গাছে জল-টল দেবে দাও গিয়ে—'

মহামায়া বাধা দিলেন, 'না সমু, সব ভাব আমাব উপর চাপিয়ো না। তুমিই এ-বাড়ির অভিভাবক, কথাবার্তা তোমার নিজে বলে নেয়াই ভালো। বুঝে-সুঝে কাজ করলে অনুতাপ করতে হবে না।'

মহামায়া বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। সোমেন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ ক'রে খাটের উপর বসলো এসে। কুসুম বেশ হকচকিয়ে গেল। হঠাৎ ভয়ানক ভয় করলো তার, বুকটা গলাটা কেমন বন্ধ হ'য়ে এলো। তারপর ডুবতে-ডুবতে মানুষ যেমন মরীয়া হ'য়ে ওঠে. তেমনি বেপরোয়া ভঙ্গিতে মুখ তুললো সে, চুপ ক'রে থাকতে-থাকতে অন্য দিকে তাকিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে অবাধ্য সুরে বললো, 'জানি, কী জিজ্ঞেস করবে।' তারপরেই জিব কেটে অধোবদন হ'য়ে বললো, 'ভুলে গিয়েছিলাম।'

কৌতুক বোধ করলো সোমেন, তার ফেরানো মুখের আধখানার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী ভুলে গিয়েছিলে?'

'মা আপনি বলতে বলে দিয়েছিলেন।'

'কাকে? আমাকে?'

কুসুম মাথা নাড়লো।

'মা বলেছেন বলেই বলবে? নইলে সব তুমি?'

কুসুম চুপ।

'কী জিজ্ঞেস করবো বলো তো?'

'জানি।'

'কী জানো?'

বিদ্যুৎ চমকালো কুসুমের চোখে, 'আমাকে তাড়াবার কথা।'

'তা হ'লে তো বেশ বুদ্ধিই আছে দেখছি।'

কুসুম চুপ।

'তা হ'লে কবে যাচ্ছো?'

'মা যেদিন বলবেন।'

'মা বললেই চলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'আর না বললে?'

'যাবো না।'

'আমি বললে?'

কুসুম আবার চুপ।

'জানো বোধহয়, মাকে নিয়ে আমি কলকাতা যাচ্ছি।'

'মা যাচ্ছেন?' বড়ো-বড়ো দুই চোখে পৃথিবীর আশঙ্কা নিয়ে তাকালো কুসুম।

'যাচ্ছেন বৈকি।'

'আমি!'

'তুমিও যাবে; কিন্তু কলকাতায় না, তোমার স্বামীর কাছে।'

'মা সেখানে আমাকে পাঠাবেন না।'

'বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি যদি পাঠিয়ে দি?'

'মা বলেছেন আমিও এখানে কারো চেয়ে কম নই।'

'কার চেয়ে কম নও?'

আমাকেও মা ভালোবাসেন, ঐ রকমই বাসেন।'

'কী রকম? আমার সমান?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'কারো কথায় আমার কিছু হবে না।'

'মানে, আমি বললেও তুমি যাবে না?'

'না।'

'কেন?'

'এই মা আমারও মা।'

'মা-তো তোমার, আর বাড়িটা?'

'তা-ও মায়ের।'

'কিন্তু মা যাবার সময় কী বলে গেলেন শুনলে তো?'

'কী?'

'আমিই এ বাড়ির অভিভাবক।'

'বাড়ির হ'লে আমার কী?'

'তার মানে তোমারও অভিভাবক।'

চকিতে মুখ ফেরালো কুসুম।

সোমেন বললো, 'কাজেই আমি যা বলবো তাই তোমাকে শুনতে হবে।'

কুসুম হাত মোচড়ালো, গা মোচড়ালো, সাহস সঞ্চয় ক'রে বলতে চেষ্টা করলো কিছু, তারপর পা বাড়িয়ে বললো, 'আমি যাচ্ছি।'

'বোসো।' ধমক দিলো সোমেন।

'আমার কাজ আছে।'

'এটাও তোমার কাজ।'

'কোনটা?'

'আমি যা বলবো তা করা, যা জিজ্ঞেস করবো তার জবাব দেয়া।'

কুসুমের ফর্সা রং লাল হ'লো, কালো কুচকুচে জোড়া ভুরু বাঁকা হ'লো, একদিকের চোখটা তুলে এক পলক দেখে নিলো সোমেনকে, তারপর বসলো।

'পালিয়ে এসেছো কেন?'

'আমার খুশি।'

'ফিরে যেতে চাইছো না কেন?'

'আমার ইচ্ছে।'

'তোমার বাবার নাম কী?'

'জানি না।'

'স্বামীর নাম কী?'

'জানি না।

'দেশের নাম কী?'

'জানি না।'

'কিচ্ছু জানো না?'

'মায়ের নাম জানি।'

'কী?'

'মহামায়া।'

'কৃকী?'

'মহামায়া। মহামায়া রায়চৌধুরী।' অকম্পিত কণ্ঠস্বর কুসুমের।
'মহামায়া রায়চৌধুরী?'
'হ্যাঁ।'
তাকিয়ে থাকলো সোমেন, 'তা হ'লে বাবার নামটাও জানো বোধহয়।'
'জানি।'
'সেটাও বলে ফেলো।'
'সত্যসুন্দর রায়চৌধুরী।'
'সত্যসুন্দর রায়চৌধুরী তোমার বাবা?'
'হ্যাঁ।'
'সকলের কাছে বলতে পারবে এ-কথা?'
অকাতরে ঘাড় নাড়লো কুসুম।
সোমেন বললো, 'তোমার জেল হ'য়ে যাবে তা হ'লে।'
'জেলে আমি ভয় পাই না।'
'পাও না?'
'ফাঁসিও ভয় পাই না।'
'ভয়ানক সাহস তো।'
'তুমি যদি আমাকে জোর ক'রে ধূপছায়া গ্রামে পাঠিয়ে দিতে চাও আমি থানায় চলে যাবো।'
'গিয়ে আমার নামে নালিশ করবে?'
'না।'
'তবে কী করবে?'
'সব বলবো।'
'কী বলবে?'
'আমার নিজের কথা।'
'সে কথা কী?'
'মা বলেছেন সব কথা সকলকে বলতে নেই।'
শুধু থানার লোকেদের বলতে আছে, না?'

'সে যা করি তখন সবাই দেখতে পাবে।'

'আর আমি যদি কলকাতা নিয়ে যাই ?'

'তুমি নেবার কে ? মা নিয়ে যাবেন।'

'কলকাতা তো মায়ের বাড়ি নয়, আমার বাড়ি।'

'সব বাড়িই মায়ের বাড়ি।'

'কে বলেছে ?'

'আমি জানি।'

'তুমি কি মায়ের কথা শোনো ?'

'সব শুনি।'

'তা হ'লে আমাকে আপনি না বলে তুমি বলছো কেন ?'

'ওহ্।' কুসুম জিব কাটলো।

একটা সিগারেট ধরালো সোমেন. ধোঁয়াটা উপর দিকে তুলতে-তুলতে বললো, 'তুমি যেমনি অভদ্র, তেমনি অবাধ্য।'

মুখের উপর উড়ে-আসা ধোঁয়ার পাকটা হাতের বাতাসে সরিয়ে দিয়ে খোলা চুল টান-টান ক'রে বাঁধলো কুসুম, জবাব দিলো না।

সোমেন ভুরু কুঁচকে বললে. 'জানো, আমি একজন মাষ্টার মশাই ?'

'জানি। ছাত্রীর নাম শর্মিষ্ঠা।'

'ও, তা-ও জানা আছে ?'

সোমেন সিগারেটের ছাই ঝাড়লো, 'এটা কি জানো যে মাত্র একজন ছাত্রীই নয়. অনেক ছাত্রছাত্রীকেই আমি শিক্ষা দি ?'

'জানি।'

'অবাধ্যতা করলে তাদের কী শাস্তি দিই জানো ?'

'আমি তো কারো ছাত্রী নই।'

'তুমি আমার ছাত্রী না হ'তে পারো, কিন্তু আমি তো তোমার অভিভাবক ? ইচ্ছে করলেই আমি শাস্তি দিতে পারি।'

ঈষৎ ভয়চকিত চোখে তাকালো কুসুম, তারপর ঢোঁক গিললো, তারপর বললো, 'এখানে মা আছেন, এ-বাড়ি একার মায়ের।'

'যারই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না।'
'আমি এখন নিচে যাবো।'
'নিচেই যাও আর উপরেই থাকো, আজ আমি তোমাকে জোর ক'রে ধূপছায়া গ্রামে পাঠিয়ে দেবো।'
'ন্‌না।'
'নিশ্চয়ই।'
'মা দেবেন না।'
'মা না দিন, আমি দেবো।'
'মা'র কথাই সব।'
'না, এ বাড়িতে আমার কথাই সব।'
'না, মা'র কথা ছাড়া আমি কারো কথা শুনবো না।'
উদ্‌গত কান্না দমন ক'রে উঠে দাঁড়ালো কুসুম, তারপর বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

॥ ২৮ ॥

রাত্রিবেলা শোবার আগে ছেলের মশারি ফেলে গুঁজে দিতে-দিতে মহামায়া বললেন, 'তা হ'লে কী ঠিক করলি?'
সোমেন বই থেকে চোখ তুলে বললো, 'আমার ঠিক করার জন্য কি তুমি বাকী রেখেছো কিছু?'
'কেন রাখবো না? তুই যা বলবি তাই হবে।'
'আমি তো যা বলবার রোজই বলি।'
'বলাবলির দরকার কী, কাজে করলেই হয়।'
'আদর দিয়ে-দিয়ে মাথা খেয়েছো, আমাকে যেন কতো গ্রাহ্য করছে।'
'কেন, কী বলেছে তোকে?' হাতের কাজ থামালেন মহামায়া।
'যা-তা। বলে, এ-বাড়ি কি তোমার?'
'সে কী রে?'
'বাবার নাম জিজ্ঞেস করলে বলে সত্যসুন্দর রায়চৌধুরী।'

এবার মহামায়া হেসে ফেললেন।

'মায়ের নাম বলে মহামায়া।' সোমেনও হাসলো।

'ভাইয়ের নাম জিজ্ঞেস করলেই পারতিস।'

'ওরে বাবা। যতো রাগ তো আমার উপরই। নির্ঘাৎ দুষমন বলতো।'

ছেলের কথার সুরে মহামায়া গ'লে জল হ'য়ে গেলেন। বুক থেকে যেন দশ মন পাথরটা নেমে গেল। যাক, ফাঁড়া তা হ'লে কেটেছে। ছেলেকে অখুশি ক'রে বিরক্ত ক'রে কোনো কাজ করতে হ'লে নিশ্চয়ই খুব লাগতো, আর সেটা লাগছিলোও। কেবলি ভাবছিলেন এই ধোঁয়াটা কী ক'রে সরিয়ে দেবেন মাঝখান থেকে। ঈশ্বর দয়া করেছেন তাকে। কোমল গলায় বললেন, 'যাই বলিস, মেয়েটা বড়ো ভালো। আমি কি সাধে মায়ায় পড়েছি—'

সেই রাত্রে কতোদিন পরে তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারলেন। আর সোমেনও সেই রাত্রেই হালকা মনে এক বিস্তৃত চিঠি লিখে দিলো সমীরকে।

এর পরে বাড়িতে কলকাতা যাওয়ার কথা ছাড়া আর কথা রইলো না কোনো। সোমেনের ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, চটপট গুছিয়ে নিয়ে ছেলের সঙ্গে চলে যাওয়াই ভালো মনে করলেন মহামায়া। কিন্তু গুছোবো বললেই কি গুছিয়ে ওঠা যায়? তাঁর তো ট্রাঙ্ক-বাক্স গুছোনোই গুছোনো নয়, বাড়িঘর, জায়গা-জমি, কী না? এ থেকে বছরের শেষে যা আয় হয় সেটা যাতে ঠিকমতো থাকে তার ব্যবস্থাতেই বেশী সচেষ্ট হলেন তিনি। আর তাঁর প্রাণের বাগান, যুবতী মেয়ের ঘন চুলের আঁটো খোঁপার মতো ঠাস বুনোটের গোলাপ ফুল। কী মমতা। কী মমতা। ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেই বুক ভেঙে কান্না আসে, কতো মুছে-যাওয়া সুখস্মৃতি আবার উঠে আসে মনের উপর তলায়। কিন্তু যাচ্ছেন ছেলের কাছে, ছেলে তাঁর বড়ো হয়েছে, যোগ্য হয়েছে, মাকে প্রতিপালন করবার ভার নিতে উৎসুক হয়েছে, এ-সুখই কি কম সুখ? সব ছাপিয়ে সেই তৃপ্তি, সেই

আনন্দ উপচে-উপচে উঠছে।

আর কুসুমের তো কোনো ভাবনাই নেই, তার শুধুই আনন্দ। দাদাবাবু বিষয়ে যে-দ্বন্দ্বটুকু ছিলো তা পর্যন্ত এখন নিঃশেষে মুছে গেছে। কলকাতা তার কাছে কল্পনার স্বর্গ, সেই স্বর্গে সে যাচ্ছে, জীবনে তবে আর কী দুঃখ রইলো? কিন্তু মাঝে-মাঝেই সোমেন ভয় দেখাচ্ছে নিয়ে যাবে না বলে। চা দিতে একটু দেরি করলেই ঘোষণা করছে ছোটু সিংকে দিয়ে ধুপছায়া গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

এর মধ্যেই এক দুপুরে মেলা দেখতে গেল সবাই। মহামায়া যেতে চাননি, সোমেনই নিয়ে গেল জোর ক'রে। বললো, 'চলো, চ'লো, কতোদিন দেখি না, ঘুরে-ফিরে দেখে আসি।

মহামায়া বললেন, 'দূর, আমার কি আর সে বয়েস আছে, না সে দিন আছে?

ছেলেবেলাকার মতো আবদার ক'রে সোমেন বললো, 'দুটোই আছে। তোমাকে যেতেই হবে। একমাথা কালো কুচকুচে চুল নিয়ে আর বয়সের দোহাই দিয়ো না, কেউ মানবে না সে-কথা। তাছাড়া বয়সের কথা বললে যে আমি রেগে যাই তা মনে থাকে না কেন?'

মহামায়া সস্নেহ হাস্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে বললেন, 'রাগলে কী হবে? বেলা আমার পড়েই এসেছে।'

'বেশ হয়েছে, তুমি চলো। চলেই তো যাচ্ছি গ্রাম ছেড়ে। আবার কবে আসবো, কবে দেখবো—'

এ-কথার পরে আর আপত্তি করলেন না মহামায়া। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চলো।'

'কিন্তু একটা কথা।'

'কী?'

'কুসুমকে তো নেয়া যাবে না।'

মহামায়া হাসলেন; কুসুমের চোখ বড়ো হ'লো।

'শুনেছি, ধুপছায়া গ্রামের কৈবর্তরা আজ দল বেঁধে যাত্রা দেখতে আসবে।'

কুসুমের হাতের কাজ থামলো। উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো সোমেন, 'বাজারে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিয়েছে, কুসুম নামের একটি সুন্দরী মেয়েকে ধ'রে দিতে পারলে খুব পুরস্কার দেয়া হবে।

'সব মিথ্যে কথা—'কুসুমের নিঃশ্বাস বড়ো হ'য়ে উঠলো।

'বেশ তো, চলো না, মিথ্যে সত্য নিজেই দেখবে।'

'যাবোই তো'

'আমিই কি বারণ কবছি নাকি?'

মহামায়া বললেন, 'কেন মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিস বেচারাকে। মেলায় যাবার আসল উৎসাহী মানুষটাই তো ও।'

আমিও তো সেইজন্যই উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি। মেলায় গিয়েই ওকে ধরিয়ে দেবো। বেশ পুরস্কাব পাওয়া যাবে।'

'আমি গেলে তো।'

'যাবে না মানে, যেতেই হবে।'

'কিছুতেই যাবো না।'

'ঠিক আছে, আমিই খবর দিয়ে আসবো তা হ'লে।'

'মা!'

'কী বোকা ঠাট্টা বুঝিস না কেন?'

'ঠাট্টা নয়, ওরা ঠিক আসবে মেলাতে।'

'তোকে খুঁজতে, না?'

'না, মেলা দেখতে।'

'দশ মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে কেউ মেলা দেখতে আসে না।'

'যদি আসে?'

'কেন আসবে? মেলা কি এই একটাই হচ্ছে? এখন তো গাঁয়ে-গাঁয়ে মেলা বসছে। কেন, তোদের গাঁয়ে কোনোদিন মেলা হয় না এ-সময়ে?'

'কতো। মেলা হয়, সার্কাস হয়।'

'তবে? এখানে আসবে কেন?'

'কিন্তু দাদাবাবু যে—'

'তোকে খেপাচ্ছে এ-ও বুঝিস না?'

'বেশ তো, খেপাচ্ছি কি খেপাচ্ছি না কাজেই দেখবে।'

'মা—'

'যাবি তো তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নে, যা।'

কাজে আর আপত্তি কি কুসুমের। এক হাতকে সে দশ হাত বানিয়ে দেখতে-দেখতে ঘর-দুয়োর ঝেড়ে-মুছে, কাপড়-চোপড় তুলে, চা ক'রে নিয়ে এলো। নিবারণ বললো, 'তোমরা কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিবো, আমি আর ছোটু আজ যাত্রা দেখতে যাবো।'

মহামায়া বললেন, 'আমরা আর কতোক্ষণ। তোমরা প্রস্তুত হ'তে-হ'তেই এসে যাবো। উনুনের আঁচ ফেলে দিয়ো না যেন, দাদাবাবু এসেই তো চা চাইবেন, তারপর খাবার গরম করতে হবে।'

সাজগোজ ক'রে নিলো কুসুম। মহামায়াই সুন্দর ক'রে চুল বেঁধে সাজিয়ে দিলেন। নিজেও শাড়ি বদলালেন। কতোকাল পরে রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে ভারি ভালো লাগলো তাঁর।

সোমেন বললো, 'দেখেছো তো দেশ স্বাধীন হ'য়ে কতো কিছু হয়েছে। কী সুন্দর পাকা রাস্তা, ইলেকট্রিকের আলো, কতো বড়ো লাইব্রেরি—।' এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে মাকে সারা সহর দেখাতে-দেখাতে নিয়ে চললো সোমেন।

মহামায়া বললেন, 'আমি তো এ-সব কিছুই দেখিনি, শুনেছি মস্ত হাসপাতাল হয়েছে, মেয়েদের হাইস্কুল হয়েছে, আর আগে কী ছিলো—'

কথায়-কথায় এসে পড়লো বাঁধের ধারে। সত্যিই মস্ত মেলা বসেছে। গিসগিস করছে লোক, বাচ্চারা নকল ট্রেনে চড়ছে,

বয়স্করা নাগরদোলায় চড়ছে, ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁদর নাচ হচ্ছে কোথাও, চলন্ত চিড়িয়াখানা এসেছে, তাতে বাঘ সিংহ সাপ কিছু বাকী নেই। অনেক ঘোরাঘুরি হ'লো, অনেক দেখা হ'লো, মাটির পুতুল কেনা হ'লো, কুসুমের হাতভর্তি কাচের চুড়ি লাভ হ'লো, তারপর বাড়ি ফেরা।

কিন্তু সর্বনাশটা হ'লো বাড়ির কাছাকাছি এসে। হঠাৎ মহামায়ার হাত আঁকড়ে ধরলো কুসুম।

'মা!'

'কী রে?'

'ঐ যে—'

'কী—'

'সেই লোকটা।'

'কোন লোকটা?'

'সেই কোঁকড়া চুল, যে-লোকটার জন্য আমি—' কুসুম জিব দিয়ে ঠোঁট চাটলো, তার হাত মহামায়ার হাতের মধ্যে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো।

অবাক হ'য়ে মহামায়া বললেন, 'কী হয়েছে? কী বলছিস?'

'আমার স্বামীকে যে টাকা দিয়েছিলো, ঐ যে বলেছিলাম—' মহামায়া চট করে পিছন ফিরে তাকালেন, তার চেয়েও দ্রুত কোনো লোক একটা গাছের আড়ালে ঢাকা দিলো নিজেকে।

সোমেন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলো। মহামায়ার কপাল কুঁচকে উঠলো, দাঁড়িয়ে পড়লেন সেখানে—'তুই ভয় পাচ্ছিস কেন, ঐ লোকটাকে ধরা দরকার।'

'বাড়ি চলো মা, বাড়ি চলো।' মনে হ'লো কুসুম সেখানেই বুঝি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যাবে। মহামায়ার আর অপেক্ষা করা হ'লো না। বললেন, 'তাড়াতাড়ি পা চালা, বাড়ি গিয়েই আমি সমুকে আর ছোটুসিংকে পাঠিয়ে দেবো, ঝুঁটি ধ'রে নিয়ে আসবে।'

'না, না—'

'আমার অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছিলো লোকটা যেন পিছু নিয়েছে। ভালোই হ'লো, এবার ধ'রে কিছু শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো। কতদূর আর পালাবে এই সময়টুকুর মধ্যে। দরকার হ'লে আমি নিজে যাবো, ঠিক চিনতে পারবো আমি।'

॥ ২৯ ॥

কিন্তু বাড়ি পৌঁছে সমস্ত রং বদলে গেল। হাঁপাতে-হাঁপাতে কুসুম বললো, 'এখন আমি কী করবো? কোথায় লুকোবো? কোথায় যাবো?'

'কোথাও যেতে হবে না।' মহামায়া দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'এখানেই থাকবি তুই। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। এতোদিন আমি এ-সব ঘাঁটাবো না ভেবেছিলাম, এখন যখন লোকটা বাড়ি চিনে গেল, তখন ওরা আসবেই। অন্য কোনো কারণে না হোক. তোকে শাস্তি দেবার জন্যই নিয়ে যাবে টেনে, আমিও প্রস্তুত থাকবো, লড়াই যদি বাঁধেই, আইন-আদালত ক'রে ঐ বদমাস স্বামীর হাত থেকে আমি তোকে রক্ষা করবো।'

'আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না মা।'

'নিশ্চয়ই পারবো। তুই ছাখ না একবার—'

'মা গো—'

'যেই আসুক, হোক তোর স্বামী, হোক তোর শাশুড়ি—'

'শাশুড়ি!' ভয়ার্ত গলায় অস্ফুটে চেঁচিয়ে উঠলো কুসুম, 'শাশুড়ি কই, সে তো নেই।'

'নেই মানে! এই যে তুই বললি—'

'ম'রে গেছে। সে ম'রে গেছে।'

'ম'রে গেছে! তবে তুই মিথ্যে কথা বলেছিলি?'

'না না, মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়, সব সত্য।'

'তবে?'

কুসুমের জিব শুকিয়ে গেল, চোখের তারা স্থির হ'লো, তাকিয়ে থেকে সম্মোহিতের মতো বললো, 'আমি তাকে খুন ক'রে পালিয়ে এসেছি।'

'কী বলছিস!'

'খুন। আমি খুন ক'রে এসেছি তাকে। এতোদিন সে কথাটাই তোমাকে বলতে চেয়ে বলতে পারিনি।'

'খুন করেছিস! একটা মানুষকে খুন করেছিস তুই! তুই খুন ক'রে পালিয়ে এসেছিস?'

'তুমি তো সব জানো, তুমি তো জানো, এই লোকটার সঙ্গে শোবার জন্য ওরা আমাকে জবরদস্তি করেছিলো, আমার শাশুড়ি আমার পিঠে চিমটে দিয়ে গনগনে আগুনের টুকরো চেপে ধরেছিলো; আমার তখন জ্ঞান ছিলো না, আমি সহ্য করতে না পেরে হাতের কাছে যা পেয়েছিলাম ছুঁড়ে মেরেছিলাম, আমি জানতাম না অত জোরে লাগবে, আমি জানতাম না অমন ক'রে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে মাথা দিয়ে, কপাল বেয়ে অমন ঢল নেমে ম'রে পড়ে যাবে মানুষটা। তাকিয়ে দেখে ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল, আমি দিগ্বিদিক ভুলে রান্নাঘরের পিছন দিয়ে নর্দমা ডিঙিয়ে অন্ধকারে দৌড় লাগালাম—'

'সর্বনাশ! সর্বনাশ!'

মহামায়া বসে পড়লেন মেঝের উপর, তাঁর ঘাম ছুটলো কপাল দিয়ে, পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের স্রোত নামলো, কয়েক মিনিটের জন্য তাঁর চোখের পলক নড়লো না, কয়েক পলক হৃৎপিণ্ডটা থেমে রইলো।

সোমেনও শুনলো। তার রক্তচলাচল উত্তপ্ত এবং দ্রুত হ'য়ে উঠলো। সেও স্তম্ভিত হ'য়ে বসে রইলো চেয়ারে। মুহূর্তের মধ্যে আনন্দিত বাড়িটা যেন একটা প্রেতলোকে পরিণত হ'য়ে গেল।

কিন্তু তারপর? তারপর কী? কী করা যাবে এখন? বাড়িতে এক খুনী এসে লুকিয়েছে, কী ব্যবস্থা হবে তার? অন্ধকারে একলা রাস্তায় ঘাড় ধ'রে বার করে দেবে, না সব জেনেও রক্ষা ক'রে দোষী হবে আইনের চোখে? কী? কী? কী? মহামায়া মরমে ম'রে গেলেন ছেলের কাছে, অপরাধের ভারে এইটুকু হ'য়ে গেলেন। তাঁর কান্না পেলো, তাঁর চিৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে করলো, বুকটার ভিতরে যেন সহস্র হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগলো, উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে দৌড়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে লক্ষ্মীর আসনের তলায় লুটিয়ে পড়লেন।

শূন্য দৃষ্টি মেলে একা ঘরে হাঁটু ভেঙে বসেছিলো কুসুম, সোমেন এসে দাঁড়ালো। কঠিন গলায় বললো, 'এখন তুমি কী করবে?'

কুসুমের নীচু-করা মাথা আরো নীচু হ'লো।

'এ-সব তুমি মাকে লুকিয়েছিলে কেন?'

'লুকোতে চাইনি, বলতে ভয় করেছে।'

'এর কী শাস্তি তা তুমি জানো?'

'জানি।'

'এ-জন্যেই তুমি সেখানে ফিরে যেতে চাওনি?'

'না, সেজন্য নয়।'

'নিশ্চয়ই।' সোমেনের ক্ষুব্ধ গলা ধমকে উঁচু পর্দায় উঠলো।

চোখ তুলে তাকালো কুসুম, আবারও বললো, 'না, সে-জন্য নয়।'

'তবে কী জন্য যাওনি?'

'আমি ওদের সহ্য করতে পারিনি, ওদের চাইনি, ওরা আমার কেউ না।'

'কিন্তু আজ যদি ওরা এসে বলে যে এ নিয়ে তারা কোনো নালিশ করেনি, গোলমাল করেনি, সমস্ত ব্যাপারটা চেপে গেছে, অথবা তুমি যা ভাবছো তা ভুল, তোমার শাশুড়ি আদৌ মারা যাননি, তা হ'লে তুমি কী করবে?'

'আমি যাবো না।'

সোমেন অসহিষ্ণু হ'য়ে বললো, 'যাবে না তো থাকবে কোথায় ?'

'আমি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরবো, ভিক্ষে করবো, ধরা পড়লে ফাঁসি যাবো—কিন্তু ওদের কাছে ফিরে যাবো না।'

'তুমি খুব চালাক, তুমি ঠিক জানো মা তোমাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন, সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই তুমি শুধু আমার মাকে নয়, আমাকেও এই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছো।'

এ-কথায় কুসুমের সমস্ত শরীরটা যেন যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠলো। কী জবাব দিতে গিয়েও দাঁতে দাঁত আটকে চুপ ক'রে রইলো। সোমেন পাইচারি করলো এ-মাথা ও-মাথা, আবার এসে দাঁড়ালো, 'তুমি জানো, ওরা যদি আজ পুলিশ নিয়ে আসে, ধরা পড়লে তুমি একলাই পড়বে না, আমাদেরও হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাবে ?'

'কেন ?'

'তোমাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য। তোমাকে আশ্রয় দেয়া পাপ !'

'পাপ !'

'নিশ্চয়ই। তুমি যে অপরাধ ক'রে পালিয়ে এসেছো, আইনের চোখে তার চেয়ে বড়ো অপরাধ আর নেই।'

'কিন্তু আমাকে যে ওরা মারতো।'

'মেরে তো ফেলেনি।'

'ম'রে যাইনি, তাই। যদি ম'রে যেতাম ?'

'সে-কথা আলাদা।'

'কিন্তু আমি তো ইচ্ছে করে করিনি, আমি তো মেরে ফেলতে চাইনি, হ'য়ে গেছে, না-বুঝে হ'য়ে গেছে, সইতে না-পেরে হ'য়ে গেছে।'

'কিন্তু পুলিশ সেটা শুনবে না।'

'যদি পুলিশকে কেউ গরম কয়লা পিঠে চেপে ধরে, সে কি পারবে চুপ ক'রে সয়ে থাকতে ? যদি তাদের বৌকে কেউ অন্যের সঙ্গে না-শুলে অত্যাচার করে, তাহ'লেও কি তারা কিছু বলবে না ? আমি

তাদের বলবো, আমি সব বলবো, সব শুনলেও কি তারা—' রুদ্ধ কান্নায় ডুবে গেল কুসুমের গলা ; সহসা নিজেকে সে আছড়ে ফেললো সোমেনের পায়ের উপর, 'মা ছাড়া আমার কেউ নেই, মাকে ছেড়ে কোনোদিন কোথাও যেতে হবে ভাবতেই আমার সমস্ত ভালোমন্দ এক হয়ে যায়, তাই আমি কতোদিন বলতে চেয়েও বলতে পারিনি। কিন্তু আমি বিপদে ফেলতে চাইনি। বিশ্বাস করুন, আমি তা পারি না।' কান্নার দমকে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো সে। কিন্তু তখুনি শান্ত হ'য়ে বললো, 'এতে মা'র কী দোষ ? আমি যদি আমার পরিচয় লুকিয়ে কারো কাছে ঝি হ'য়ে এসে কাজে লাগি, তিনি কী ক'রে জানবেন আমি অপরাধ ক'রে এসে লুকিয়ে আছি। কিন্তু তবও তবুও—' আবার গলা তার বন্ধ হ'য়ে গেল কান্নায়। উঠে দাঁড়ালো সে. দ্রুত পায়ে চলে এলো সিঁড়ির দিকে।

'কোথায় যাচ্ছো ?'

কুসুম জবাব দিলো না। দৌড়ে নেমে এলো নিচে, কিন্তু ফটকেব কাছে এসে থামতে হ'লো। তালা বন্ধ।

সে যতোটা দ্রুত এসেছিলো, ফটক খোলা থাকলে রাস্তার অন্ধকারে যে-কোনো একদিকে দৌড়ে হারিয়ে যেতে অসুবিধে ছিলো না কোনো। কিন্তু পিছনে-পিছনে এসে ধ'রে ফেললো সোমেন। তুই ধমক দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলো উপরে। চাপা গর্জনে বললো, 'অনেক জ্বালিয়েছো, অনেক বোকামি করেছ, এখন চুপ ক'রে বসে থাকো এখানে।'

॥ ৩০ ॥

খাটের বাজুতে ঠেসান দিয়ে নিঝুম হ'য়ে বসে আকাশপাতাল ভাবছিলেন মহামায়া। ব্যস্ত হ'য়ে সোমেন বললো, 'শোনো, মা।'

'কী ?'

'টাকা বার করো।'

'টাকা।' যেন মৃত্যুর পরপার থেকে কথা বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, টাকা। ওকে কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে।'

'কোথায় ?'

'স্টেশনে নিয়ে গিয়ে যেখানে হোক কিছু ঠিক ক'রে একটা টিকিট কেটে চাপিয়ে দেবো।'

'তারপর ?'

'তারপর দেখা যাবে। আপাতত কোথাও গিয়ে গা-ঢাকা দেওয়া দরকার।'

'এমন একা-একা ও কোথায় গিয়ে গা-ঢাকা দেবে, সমু।' প্রায় কেঁদে ফেললেন তিনি।

সোমেন মাথার চুল টেনে ঝেঁকে উঠলো 'তবে কী করতে বলো ? এখানে থেকে ফাঁসি যেতে বলো ?' দু' পাক এ-মাথা ও-মাথা হেঁটে নিলো সে, 'হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকলে তো কিছু হবে না। একটা তো কিছু করতে হবে ?'

হঠাৎ ঠুক ক'রে একটা আওয়াজ হ'লো কোথায়, চমকে উঠলো সবাই। সোমেনের মনে পড়লো কুসুমকে নিয়ে উঠে আসবার সময়ে বৈঠকখানার দরজাটা বন্ধ ক'রে আসতে ভুলে গিয়েছিলো। তাড়াতাড়ি নেমে গেল সেই দরজা বন্ধ করতে। দরজা বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে থাকলো খানিকক্ষণ, ঘড়ি দেখলো, একটা সিগারেট ধরালো, আবার দরজাটা খুলে বাইরে এলো, তাকিয়ে রইলো রাস্তার দিকে, তারপর আবার দরজা বন্ধ ক'রে উদ্‌ভ্রান্ত পায়ে উঠে এলো দোতলায়। মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো 'ওঠো। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় দেখছি না আমি। লোকটা যখন টের পেয়েছে, বাড়ি দেখে গেছে, নিশ্চয়ই এতোক্ষণে খবরাখবর হ'য়ে গেছে পুলিশে। আর রাগটা তো ওরই সবচেয়ে বেশী। ও-ই টাকা খরচ ক'রে ভোগ করতে পারেনি। কাজেই ও ঠিকই আসবে পুলিশ নিয়ে, আর পুলিশ নিয়ে যদি আসেই, ধরা পড়তেই হবে, আর ধরা পড়া মানে যে কী তা তো জানো ?'

'সমু, আমার জন্যই এই কাণ্ড হ'লো তুই তো বলেইছিলি—'

'আঃ.' সোমেন বিরক্ত হ'লো, 'বিলাপের তুমি অনেক সময় পাবে মা, শান্ত হ'য়ে যা করবার করো।'

'আমি শান্ত হ'তে পারছি না, আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। তা নইলে এতো অপরাধ জেনেও আমার কেন রাগ হচ্ছে না ওর উপর, কেন আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি না, কেন আমি ভাবতে পারছি না ওর কৃতকর্মের জন্য ওর শাস্তি হওয়াই উচিত।'

'অপরাধের বিচার থাক, মানুষের সহ্যের সীমা ছাড়ালে তার কোনো ব্যবহারই অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। হৃদয় দিয়ে বিচার করলে, যারা ওকে দিনের পর দিন একটা শুয়োরের মতো খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে মেরেছে, তাদের অপরাধ নিশ্চয়ই অনেকগুণ বেশী। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত, ও তাই করেছে। কিন্তু এখানে হৃদয়ের প্রশ্ন নেই, আইনের প্রশ্ন। সেই আইনের হাত থেকে ওকে কী ক'রে বাঁচানো যায় সেটাই ভাবো। যদি বলো আমি নিজেই ওকে নিয়ে যেতে পারি কোথাও। মোট কথা, ওকে এখানে আর এক মুহূর্তও রাখা নিরাপদ নয়।'

'কিন্তু সমু—'

কথা শেষ হ'তে পারলো না, মনে হ'লো কেউ যেন লাফিয়ে নামলো গেট ডিঙিয়ে, তার পরেই প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা পড়লো এইমাত্র বন্ধ-ক'রে-আসা নিচের বসবার ঘরের দরজায়। মহকুমা সহরের এক কোণে রাত দশটায় দশ বিঘেওলা জঙ্গল-পুকুর-বাগান ঘেরা নিস্তব্ধ বাড়িটা যেন চমকে লাফিয়ে উঠলো। কেঁপে উঠে পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে তারা যেন ম'রে গেল।

অতিথিরা প্রত্যাশিত। তবু এই আবির্ভাব কেউ বিশ্বাস করতে পারছিলো না। বিপদ যে এতো তাড়াতাড়ি এমন হুড়মুড় ক'রে এসে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে এটা যেন জানা ছিলো না কারো। শিকার যাতে না ফসকায়, হয়তো এইজন্যই এতো তৎপর হয়েছে পুলিশ।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সকলের শরীরের সমস্ত কলকব্জা থেমে রইলো

একযোগে। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা একটা জমাট কঠিন কবরের অন্ধকারে নিয়ে গেল তাদের। সোমেন ছটফট ক'রে বেরিয়ে এলো বারান্দায়, সঙ্গে-সঙ্গে মহামায়া প্রায় লাফিয়ে গিয়ে টেনে আনলেন তাকে, বড়ো বড়ো নিশ্বাস নিয়ে ফিসফিস করলেন, 'না, তুই না, আমি। আমি যাচ্ছি। শোন, একটা উপায়। বাঁচবার মাত্র একটা উপায় আছে। আয় বলি। ওকে নিয়ে তুই শুয়ে পড় আলো কমিয়ে। এই মুহূর্তে তোরা স্বামী স্ত্রী। এই মুহূর্তে এই বাড়িতে তুই, আমি আর তোর বৌ ছাড়া কেউ নেই। তুই অসুস্থ, তুই উঠতে পারিস না, তুই—তুই—'

দরজার ধাক্কা প্রবল হলো ততোক্ষণে, জানালার বাইরে অন্ধকারে টর্চের তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ আকাশের বুক চিরে ঝিলিক দিয়ে গেল। মহামায়ার গলা আরো চাপা, আরো দ্রুত হ'য়ে উঠলো, 'শুয়ে পড়. শুয়ে পড়—'

'অসম্ভব! অসম্ভব!' পাগলের মতো সোমেন হাত মুঠো করলো, চুল টানলো, আবার দৌড়ে এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে! 'না, না, না—এ হয় না। হ'তে পারে না, এ-মিথ্যে টিকবে না, সর্বনাশ হবে ধরা পড়লে।'

'কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না। কা'র এতো সাহস আমার বৌকে আমার ছেলের বিছানা থেকে—'

'না, মা, না।'

'চুপ। আর-একটা কথা না—'তুই চোখ লাল ক'রে মহামায়া যেন হিস্টিরিক হ'য়ে উঠলেন, 'যা বলছি ঠিক তাই করো। আমাকে যদি মিথ্যেবাদী বানিয়ে বিপদে না-ফেলতে চাও তা হ'লে শুয়ে পড়ো, এক্ষুনি শুয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো।' আচমকা শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে ছেলেকে এক ধাক্কায় তিনি বিছানার দিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে বিদ্যুতের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর কোনো কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হ'য়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো সোমেন আর কুসুম। নিচে দরজা খোলার শব্দ হ'লো, ছোট্ট একটি কোলাহলের ঢেউ উঠলো গলা থেকে গলায়, আর সেই ঢেউ হিমস্রোত হ'য়ে বয়ে গেল সোমেনের সারা দেহের মধ্য দিয়ে। লাফিয়ে বিছানায় ঢুকে সে মস্ত-মস্ত নিশ্বাস নিয়ে বললো, 'এসো, শীগ্‌গির এসো, মা নয়তো বিপদে পড়বেন।'

নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে কুসুম, সে তাকালো না, সে নড়লো না, মনে হ'লো না তার প্রাণ আছে।

মুহূর্তের অপেক্ষা, তারপরেই মশারির ভিতর থেকে হাত বার ক'রে সোমেন এক ঝটকায় টেনে নিয়ে এলো তাকে। উত্তেজিত, বিড়ম্বিত, বিপন্ন। পুরুষের সবল আকর্ষণে কুসুম হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার বুকের উপরে। সঙ্গে-সঙ্গে বাজে তাড়া-খাওয়া পাখির মতো এক অসহায় যন্ত্রণায় থরথর ক'রে কেঁপে উঠে ভয়ে প্রচণ্ড জোরে সে আঁকড়ে ধরলো তাকে। এই অপ্রত্যাশিত কঠিন আলিঙ্গনের ঘন সান্নিধ্যে, স্ত্রীস্পর্শ-অনভিজ্ঞ সোমেনের কুমার-হৃদয় হঠাৎ এক অদ্ভুত অনুভূতির তরঙ্গে উদ্বেল হ'য়ে উঠলো।

॥ ৩১ ॥

নিচে নামতে নামতে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিলেন মহামায়া। মনে-মনে পুলিশের সঙ্গে কথোপকথনের একটি সম্পূর্ণ মহড়া দিয়ে নিলেন। ভাবলেন, যখন সারা শরীরে ঘুমের আলস্য মেখে পাকা অভিনেত্রীর মতো দরজা খুলে দিয়ে 'এ কী!' বলে সরে দাঁড়াবেন তখন নিশ্চয়ই খাকি পোষাক পরা পুলিশ অফিসারটি উদ্ধত ভঙ্গিতে বুক টান ক'রে দাঁড়িয়ে বলবে, 'দরকার আছে।'

তিনি বলবেন, 'দরকার। কী দরকার? এই রাত্রি ক'রে, এখানে—'

দেশ স্বাধীন হ'য়ে পুলিশের ব্যবহার ভদ্র হয়েছে, অনেক অল্পবয়সী শিক্ষিত ছেলেরা ঢুকেছে, এমনও হ'তে পারে সেই

অফিসারটি ছেলেবেলায় তাঁর স্বামীর ছাত্র ছিলো, তাঁর মতো একজন বয়স্ক বিধবা ভদ্রমহিলার আতঙ্ক দেখে হয়তো সে আশ্বাস দিয়ে বলবে, 'কিছু ভয় নেই আপনার, অনুগ্রহ ক'রে যদি একটু ভিতরে ঢুকবার অনুমতি দেন, কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু—'মহামায়ার আতঙ্ক তাতে একটুও কমবে না। (আর সত্যিই তো কমবে না।)

পুলিশ অফিসারটি ঘরে আসবে, টুপিটি টেবিলের উপর রেখে গদি-আঁটা নরম চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করবে, 'এ-বাড়িতে আপনারা ক'জন মেম্বার ?'

মহামায়া মুখোমুখি বসে বলবেন, 'তিন জন।'

'কে কে ?'

'আমি, আমার ছেলে আর তার বৌ।' (এখানে কি একটুও গলা কাঁপবে না তাঁর ? এতোবড়ো মিথ্যেটা উচ্চারণ করতে কি একটুও আটকাবে না জিহ্বায় ? জীবনে আর কি কখনো তিনি এমন অনায়াসে একটি মিথ্যে কথাও বলেছেন ?)

'চাকর-বাকর নেই ?'

'আছে।'

'ক'জন ?'

'আগে তিন জন ছিলো, এখন দু'জন।'

'আর একজন কে ছিলো ? আর বর্তমানেই বা কা'রা আছে তাদের নাম বলুন।'

'আগে যে ছিলো তার নাম বৃন্দাবন, সে আমার কাছে মালির কাজ করতো, বুড়ো হ'য়ে দেশে গেছে পাঁচ-ছ'মাস আগে। এখন যারা আছে, তাদের মধ্যে একজন আমার তিরিশ বছরের পুরোনো চাকর নিবারণ দাস, অন্যজন তার চেয়েও পুরোনো, তার চেয়েও বৃদ্ধ দারোয়ান ছোটু সিং।'

'তারা কোথায় ?'

'মেলায় যাত্রা দেখতে গেছে।'

'কোনো ঝি নেই?'

'না।'

'কোনোদিন ছিলো না?'

'কোনোদিন ছিলো না। তবে আজ একজন কাজ চাইতে এসেছিলো।'

'এসেছিলো! রেখেছেন তাকে? কই, সে কোথায়?' পুলিশ অফিসারের শিকারী চোখ জ্বলে উঠবে বলতে-বলতে।

মহামায়া ভালোমানুষের মতো তার সব উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে বলবেন, 'তাকে আমি রাখিনি।

'রাখেননি?'

'না।'

'কেন?'

'দরকার ছিলো না।'

'তার সঙ্গে আপনার কখন দেখা হয়েছিলো?'

'দেখা হয়েছিলো মেলাতে, ধরুন সন্ধে সাতটা। (সময়টা ঠিক আছে তো?) সেখান থেকে কাজ চেয়ে সে আমার পিছনে-পিছনে আমাব বাড়ি পর্যন্ত এসেছিলো। মেয়েটি অল্পবয়সী, দেখতে সুন্দর, কথাবার্তা মিষ্টি, খুব দুঃখ হচ্ছিলো আমার। ভাবলাম, এতো ক'রে থাকতে চাইছে, রাখি।'

'তারপর? তারপর?' (উৎসাহ আবার জ্বলে উঠবে)

'তারপর বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ যে তার কী হ'লো, কেমন যেন ভয় পেলো সে, কোনো কথা ঠিক না-ক'রে হঠাৎ—আচ্ছা, আজ যাই, বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল।'

'চলে গেল? কোনদিকে গেল?'

'অত তো আমি লক্ষ্য করিনি, কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো?'

'আমাকে আর আপনি বলছেন কেন?' পুলিশ ছেলেটি বিনীত হাস্যে তাকাবে মহামায়ার দিকে, 'আমি মাষ্টার মশায়ের ছাত্র ছিলাম।'

'ও, তুমি ছাত্র ছিলে ?' একেবারে গলে যাবেন মহামায়া, ব্যাকুল গলায় বলবেন, 'কী হয়েছে বাবা, আমাকে খুলে বলো তো, আমার বড্ড ভয় করছে।'

'ভয় পাবার কিছু নেই।' ঘরের চারদিকে তাকাবে সে আলাপের ভঙ্গিতে বলবে, 'ছেলেবেলায় আমি অনেকবার এসেছি এ-বাড়িতে. সে এসেছি মাষ্টার মশায়ের কাছে নিজের গরজে, সেই, আসা আর এই আসায় অবিশ্যি অনেক তফাৎ, কিন্তু কী করবো বলুন, পরের চাকর, হুকুম তামিল করতেই হবে। নইলে এ-ভাবে এসে বিরক্ত করা—কিন্তু আপনি খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন, যে-মেয়েটি আপনার কাছে ঝিয়ের কাজ চাইতে এসেছিলো, তার নামে একটা খুনের নালিশ আছে।'

'খুন ?' (মহামায়ার প্রায় মূর্ছা যাবার দশা হবে।)

'মেয়েটা শাশুড়িকে খুন ক'রে পালিয়েছে।'

'কী সাংঘাতিক !'

'এদের ঘরে এ-সব লেগেই আছে। কেউ চাপাচুপি দিয়ে দেয়, আবার কারো আক্রোশ থাকলে আমাদের জানায়।'

'তা ঐটুকু মেয়ে. যদি একটা ভুলের বশে কিছু ক'রেই থাকে, তা হ'লেও কি তার ফাঁসি হবে ?'

'বিচার বিবেচনা ক'রে ফাঁসি না-ও হ'তে পারে, তবে যতোদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে তাকে জেলে বাস করতে হবে তা ফাঁসির চেয়ে কম শাস্তি নয়।'

'আহা-হা। তা মেয়েটি কেন খুন করলো ? নিশ্চয়ই কারণ আছে।'

'তা নিশ্চয়ই আছে। যা মারধোর করে ওরা—'

'তাই তো। আর ছাখো সব সময় তো মানুষ খুন করবার জন্যই খুন করে না, হ'য়ে যায়। হয়তো যন্ত্রণা সইতে না পেরে একটা কিছু ছুঁড়ে-টুঁড়ে মেরেছে, আর তাইতেই দৈবাৎ—' বলেই সচেতন হ'য়ে থেমে যাবেন মহামায়া, এ-সব তিনি কী বলে ফেলছেন, বন্ধ ঠোঁটের

ভিতরে দাঁত দিয়ে শক্ত ক'রে জিব কেটে রক্ত বার ক'রে ফেলবেন।

'হ্যাঁ, সেটাও হ'তে পারে।' মহামায়ার মনের ভিতরকার যুদ্ধটা আর কী ক'রে টের পাবে ছেলেটি। সে সহজ গলায় এই কথাটি বলেই জিজ্ঞেস করবে, 'আপনার ছেলেকে দেখছি না?'

'সে—সে ভারি অসুস্থ' (অসুস্থ শব্দটা উচ্চারণ করতে খারাপ লাগবে তাঁর, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করবেন। তাঁরই সৃষ্ট একজন দুঃখীর প্রাণের জন্য নিজের সুস্থ ছেলেকে অসুস্থ বলায় নিশ্চয়ই তিনি রাগ করবেন না। ভগবান, সোমেনকে তুমি ভালো রেখো।)

'অসুস্থ?'

'কয়েকদিন আগে বৌমাকে নিয়ে সে কলকাতা থেকে এসেছে, পথে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়, সেই জ্বরই বেড়ে কাল হ'য়ে দাঁড়ায়। আমি যে কী অশান্তিতে আছি।'

'কী কাণ্ড! এই রাত্তিরে, এই অসুখ-বিসুখের মধ্যে—সত্যি আমি অত্যন্ত লজ্জিত। কিন্তু কী করবো বলুন, একান্ত নিরুপায় হ'য়েই— কিন্তু আপনার বৌমা?'

'বৌমা!' এখানে ঠোঁট শুকিয়ে যাবে মহামায়ার—কিন্তু তিনি অবিচলিত হ'য়ে বলবেন, 'সে বেচারা খেটে-খেটে ক্লান্ত, একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। আমরা পালা ক'রে রাত জাগি কিনা। তুমি যদি বাবা একটু কষ্ট ক'রে তাদের ঘরটা দেখে যাও, তাহ'লে তাকে ডাকি না। মানে আমার একটু ডাকতে ইয়ে হচ্ছে, মানে—'

'বুঝেছি। ডাকবার দরকার নেই কোনো। নিয়মমতো দেখে গিয়ে একটা রিপোর্ট দেয়া এই আর কি। তা ছাড়া যে-লোকটা খবর দিয়েছে এ-বাড়িতে আসতে দেখেছে বলে, সনাক্ত করতে সেও সঙ্গে আছে কিনা, তাই সকলের খোঁজ নেয়া।'

'সনাক্ত? তাই বলে একটা উটকো লোক আমার বৌমাকে সনাক্ত করতে ঘরে ঢুকবে!' এখানে আভিজাত্যের গৌরবে ফেটে যাবেন মহামায়া। ছেলেটি ঠাণ্ডা করবে তাঁকে, 'আপনি যখন বলছেন আপনারা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই, তখন আর ওকে

ডাকবো কেন ? আমিই যা দেখবার দেখে যাবো।'

'হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই। এই তো আমার বাড়ি। সব ঘরই তো খালি পড়ে আছে, কেবল উপরে এক ঘরে এক খাটে আমি, আর এক ঘরে আর-এক খাটে ছেলে আব বৌ। চলো, দেখবে চলো। একটু আস্তে গেলে তাদের ঘুমও ভাঙবে না আর—'

'আপনি যখন বলছেন, আমাব না-দেখলেও চলে, তবে আবার—'

'না বাবা, না। তুমি ভালো ক'রেই দেখে যাও। যাবো বলেই যে সেই খুনী মেয়ে চলে গেছে তার ঠিক কী ? সে যে কোনো ফাঁকে আবার ঢুকে পড়ে লুকিয়ে নেই ঘরে তাই বা কে জানে।'

'তা মনে হয় না।'

'ও-সব সন্দেহের শেষ রাখতে নেই। আমার এতো বড়ো চৌহদ্দির মধ্যে—'

'না, না, না' সম্পূর্ণ অভয় দেবে ছেলেটি, 'সে-সব ভাববেন না, চারদিকে পুলিশ ঘেরাও করা হয়েছে, যদি সে ঢুকেও থাকে পালাবার পথ নেই। একটি ছুঁচও গলতে পারবে না তাদের ভেদ ক'রে। এ-কথা শুনে মহামায়া যেন পাথর হ'য়ে যাবেন, একটু আগেই সোমেন পালাতে চেয়েছিলো কুসুমকে নিয়ে। সত্যি যদি যেতো !

ভয়ার্ত হৃদয়ে ছেলেটিকে নিয়ে একতলার ঘরে-ঘবে ঘুরিয়ে দেখাবেন। তারপর আসবেন দোতলায়, আসবেন ছেলের ঘরের দরজার সামনে—কিন্তু সোমেন যদি তখনো তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে ? যদি কুসুম কিছুতেই রাজী না হয় শুতে, কিংবা সোমেনই যদি একটি সম্পর্কহীন মেয়েকে নিয়ে একশয্যায়—

দরজার ধাক্কা অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলো, মহামায়া নিজেকে সংবৃত ক'রে ঈশ্বরের নাম নিয়ে খুলে দিলেন ছিটকিনি, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বড়ো ভাসুরের দুই ছেলে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে।

'কাকিমা, শীগ্‌গির, শীগ্‌গির চলো, মেজদি বিষ খেয়েছে।'

'কে ! রমা ! রমা বিষ খেয়েছে !' এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদে

তিনি হকচকিয়ে গেলেন। 'বিষ খেয়েছে? রমা! কী বলছিস তোরা?'

'কথা বলার সময় নেই, তাড়াতাড়ি চলো। বিশ্রী কাণ্ড। সমুদাকে ডাকো। আচ্ছা দাঁড়াও, আমিই ডেকে আনছি, তুমি রওনা হ'য়ে পড়ো।' পা বাড়িয়েছিলো ব্যস্ত ছেলেটি, মহামায়া ততোধিক ব্যস্ত হ'য়ে বাধা দিলেন, 'শোন, ওকে আর ডাকবার দরকার নেই, বিকেল থেকে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে।' এতোক্ষণ মিথ্যেটা মনে-মনে সাজাচ্ছিলেন, এইবার মুখের দরজা দিয়ে সত্যি বার করতে হ'লো। কান দুটো যেন পুড়ে গেল তাঁর। আর কী মিথ্যা! ছেলের অসুখ। এমন ক'রে পাবে কোনো মা বলতে! বুকটার মধ্যে কেমন করতে লাগলো। কিন্তু কী করবেন। এ ছাড়া আর কী উপায় আছে তাঁর? ছেলেকে ডাকতে যদি তিনি নিজেও যান, এই উত্তেজিত উদ্ভ্রান্ত ছেলেরা কেউ-না-কেউ সঙ্গে-সঙ্গে উঠেই যাবে উপরে। যদি এরা কুসুমকে আর তাকে এক শয্যায় শুয়ে থাকতে ছাখে, কী ভাববে? কী না ভাববে! এর চেয়ে কুৎসিত আর কী হ'তে পারে!

সিঁড়ির মুখ জুড়ে দাঁড়িয়ে তাদের যেন ঠেকিয়ে রাখলেন তিনি, সেখানে দাঁড়িয়েই চ্যাঁচালেন, 'সমু, শুনছিস আমি একটু বিশেষ দরকারে তোর ছোড়দাদুর ওখানে যাচ্ছি, তোর ঠাকুমা ডেকে পাঠিয়েছেন। ভাবিস না, এখুনি ফিরে আসবো, তোকে নামতে হবে না, আমি বাইরের দরজায় তালা দিয়ে যাচ্ছি।'

প্রায় নিষ্ঠুরের মতো আপন ঘরের এই বিপদের দিনেও ছেলেকে খবরটা জানিয়ে সঙ্গে নিতে পারলেন না বলে বিবেক আহত হ'লো, বাইরের দরজায় তালা লাগাতে-লাগাতে ব্যথিত বোধ করলেন তিনি। কিন্তু তবুও সব ছাপিয়ে পুলিশের ভয়ই তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলো বেশী। মনে-মনে প্রার্থনা করলেন, 'হে ভগবান, আজ রাতটা নিরাপদে কাটতে দাও, কাল ভোর না-হ'তে ওকে আমি কলকাতা পাঠিয়ে

দেবো। তারপর যা থাকে অদৃষ্টে।'

॥ ৩২ ॥

মা'র গলা পেয়ে উৎকর্ণ হ'লো সোমেন। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করলো তাঁর কথার মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্ন অর্থ লুকোনো আছে, কিনা। অথবা তিনি যা বললেন, ঠিকমতো শুনেছে কিনা।

আস্তে ডাকলো, 'কুসুম।'

কুসুম সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে বললো। কমানো লণ্ঠনের আলোয় দুই বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকালো সোমেনের দিকে। তারপরেই মুখ নীচু ক'বে বললো, 'আমি যাচ্ছি।'

সোমেনও উঠে বসলো, 'আমি তোমাকে যেতে বলছি না। মা যা বললেন শুনেছো?'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ ও-বাড়িতে গেলেন কেন?'

'জানি না।'

'তার মানে পুলিশ আসেনি, ওরাই মাকে ডাকতে এসেছিলো?'

'আমি জানি না।'

'কিন্তু কেন? কেন ওরা এতো রাত ক'রে ডাকতে এলো? আর মা-ই বা কেন ভালো ক'রে কিছু না-বলে চলে গেলেন। কেন?'

'আমি দেখে আসছি।'

'না, না, তোমাকে নামতে হবে না। শেষে কী থেকে কী হবে। তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো, আমিই দেখে আসছি।'

সোমেন আস্তে খাট থেকে নেমে এসে ভেজানো দরজা ঠেলে অন্ধকার বারান্দায় উঁকি দিলো। চট ক'রে পা বাড়াতে ভরসা পেলো না। মা যদি তাকে পুলিশের কাছে অসুস্থ বলে থাকেন আর তারা যদি তাকে হাঁটাহাঁটি করতে ছাখে, দুটোয় কোনো সামঞ্জস্য থাকবে না। ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া এই মুহূর্তে কুসুম আর

সে স্বামী-স্ত্রীর পার্ট করছে, একা বিছানায় কুসুমকে দেখে কেউ হয়তো কুসুম বলে সনাক্ত ক'রে ফেলতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া একটি মেয়েকে কেউ তার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু কল্পনাও করতে পারবে না। মনেই হবে না কিছু। মা'র বুদ্ধিকে প্রশংসা না-ক'রে পারলো না সোমেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় তবে তো?

কাটলো খানিকক্ষণ।

কিন্তু সময়ের ভার কী ভীষণ। অসহায় সোমেন একটা কারাগারে বন্দী মানুষের মতো ঐ ঘরটুকুর মধ্যে পাইচারি করতে লাগলো অস্থির হায়েনার মতো।

সারা বাড়িতে এতোটুকু শব্দ নেই। ক'টা বাজলো? কী হ'লো? জানালাটা খুলে কি দেখবে একবার? টুপ্ ক'রে বাদাম পড়লো একটা, বাদুড়ে খেয়ে ফেললো। শুকনো পাতা মাড়িয়ে বোধহয় কোনো সরীসৃপজাতীয় জীব হেঁটে গেল এ পাশ থেকে ও পাশে। দূর থেকে মাদলের আওয়াজ ভেসে এলো। হুইসিল বাজিয়ে রান্নাঘরের পিছনের রেললাইন দিয়ে মালগাড়িটা চলে গেল প্রচণ্ড ঝংকারে।

আর পারলো না সোমেন, একটা চাদর জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, সাবধানী দৃষ্টি মেলে অন্ধকারে চোখ চালিয়ে বেড়ালের ইঁদুর খোঁজার মতো হ'য়ে নিজেকে একাগ্র করলো, কান পেতে রইলো অনেকক্ষণ, তারপর কোনো শব্দ না-ক'রে শুধু পায়ে আস্তে-আস্তে পা ফেলে এক সিঁড়ি এক সিঁড়ি ক'রে নামতে আরম্ভ করলো নিচে। সিঁড়ির শেষ ধাপটিতে এসে নিশ্বাস নিলো একটু। নাঃ, কেউ নেই। সুনসান বাড়ি। শুধু একটি লণ্ঠন জ্বলছে কালি ছড়িয়ে ছড়িয়ে। সেই লণ্ঠনটি হাতে ঝুলিয়ে ভূতের মতো ঘুরতে লাগলো ঘরে-ঘরে। সামনের দরজা টেনে বুঝতে পারলো, সত্যিই মা বাইরে থেকে তালা দিয়ে গেছেন।

তা হ'লে সত্যিই পুলিশ আসেনি। মা তাহ'লে ছোড়দাহুর বাড়িতেই গিয়েছেন? কিন্তু কেন গেলেন? এটাও কি তবে কুসুমকে বাঁচাবার আর-একটা নতুন বুদ্ধি তাঁর?

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি ক'রে অশান্ত হৃদয়ে আবার সে উঠে এলো উপরে। ভয় কমে গিয়ে এতোক্ষণে বুদ্ধিটা যেন অনেকটা স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু ঘরে এসে দাঁড়িয়েই চমকে গেল। কুসুমের কথা এতোক্ষণ মনেই ছিলো না, প্রায় হঠাৎ নিজের বিছানায় নেটের মশারির তলায় হাঁটুতে মুখ গুঁজে রঙিন শাড়ি পরে বসে-থাকা সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে সহসা বুকের কোথায় একটু কাঁপন লাগলো। একটু সময় দাঁড়িয়ে রইলো সে।

তারপর এসে চেয়ারে ব'সে একটি সিগারেট ধরালো।

তাকে দেখে তাড়াতাড়ি নেমে দাঁড়ালো কুসুম। উসকোখুসকো চুলে, ভেঙে পড়া খোঁপায়, কুণ্ঠিত চেহারায় তাকে অন্যরকম দেখালো।

ভয়-ভয় চোখে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলো সে, ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করলো, 'মা বাড়ি নেই?'

'না।'

'পুলিশ আসেনি?'

'না।'

'আমি ও-ঘরে যাই?'

'যেতে পারো।'

হু' পা গিয়ে কুসুম আবার ফিরে দাঁড়ালো, 'মা কখন আসবেন?'

'জানি না।'

'মা কেন গেলেন?'

'জানি না।'

তবু কী ভেবে কুসুম ইতস্তত করতে লাগলো।

লক্ষ্য ক'রে সোমেন বললো, 'ভয় করছে?'

'না।'

'তবে ?'

তবে যে কী. কুসুম জানে না সে-কথা।

'যাও, শুয়ে পড়ো গে।' আধ-খাওয়া সিগারেটটা পায়ের চাপে নিবিয়ে দিলো সোমেন। তাকিয়ে থেকে বললো, 'আর যদি ভয় করে এখানে আমার বিছানাতেও ঘুমিয়ে পড়তে পারো. আমি বসে আছি।'

'আমার ঘুম পায়নি।'

'তা হ'লে আর কি ইচ্ছে করলে এ-ঘরেও বসতে পারো।'

'আপনার খাবারটা নিয়ে আসি ?'

'খাবার ? তা বেশ তো!' এতোক্ষণে সোমেনের খেয়াল হ'লো অশান্তিতে কারোই খাওয়া হয়নি এখনো। খাবার কথায় খিদে অনুভব করলো। কিন্তু তক্ষুনি আবার ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো মন, মায়ের জন্য গভীর উৎকণ্ঠা অনুভব করলো সে।

বোধহয় সে-কথা বুঝতে পারলো কুসুম. কিংবা তার নিজের মনেও সেই একই উদ্বেগের টানাপোড়েন চলছিলো। অপেক্ষা ক'রে বললো. 'খেয়ে গিয়ে একবার মাকে দেখে এলে হয় না ?'

'তাই ভাবছি।' টেবিলের উপর থেকে সোমেন যে-কোনো একটা বই টেনে নিয়ে পাতা উলটোলো, 'কিন্তু কেউ তো আবার বাড়ি নেই। নিবারণদা বা ছোটু সিং এলে ওদের রেখে তবেই আমি যেতে পারি।'

আমি তো আছি।'

'তোমার জন্যেই তো ভাবনা।'

'আমার জন্য কিসের ভাবনা ?'

একটু হাসলো সোমেন, 'এই সাংঘাতিক পার্টটা তা হ'লে কিসের জন্য করলাম ?'

একটু থামলো, ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললো, 'সত্যি যদি পুলিশ আসতো কিছুতেই ভাবতে পারতো না অভিনয়। এই ছাখো—' সোমেন উঠে দাঁড়ালো, 'ভয়ে তুমি আমাকে কী ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলে ছাখো।

গেঞ্জিটা পুরোনো বটে, কিন্তু কাঁধের কাছে এমন ক'রে ছেঁড়া ছিলো না, আর কী কান্না কেঁদেছো তা-ও ছাখো।'

দেখলো কুসুম। কাঁধের কাছের ছেঁড়াটাও দেখলো। বুকের কাছে চোখের জলের সিক্ততাও দেখলো। তার সমস্তটা শরীর যেন হঠাৎ আগুনের তাতে গরম হ'য়ে উঠলো।

পরিশেষ

॥ ১ ॥

তাড়াতাড়িই ফিরে এলেন মহামায়া। রমা যে আফিং খেয়েছিলো বললেন সে-কথা। খুব অল্প খেয়েছিলো বলেই যে অল্পেতেই রক্ষা পেয়েছে তা-ও বললেন। আর কারণটা বললেন প্রেম। ভালোবাসা। যাকে বিয়ে করতে চায় তাকে না-পাবার বেদনা। অথচ ছেলেটি কিছু অপছন্দের নয়। লেখাপড়াও জানে, চাকরিও করে, দেখতেও ভালো। কিন্তু যেহেতু মেয়ে নিজে নির্বাচন করেছে সেহেতুই সকলের রাগ। ফলে তর্কাতর্কি, মন-কষাকষি, তারপর এই।

যাত্রা দেখে ফিরে এসে সব শুনতে-শুনতে নিবারণ তার পাকা মাথা নেড়ে বললো, 'ও-সব কিছু না বৌমা। আসলে মরবার ইচ্ছে মানুষের একটা নেশা। তখন সে ফাঁসি দিয়েই মরুক, বিষ খেয়েই মরুক, আর গলায় কলসি বেঁধে জলে ডুবেই মরুক, মরবেই। আর কিছু না পারুক রেলের তলায় মাথা দিলেও দেবে।' তার একটি উদাহরণও উপস্থিত করলো সে। কে তার চেনা এক ভদ্রলোকের স্ত্রী, সব চেষ্টা ক'রেও যখন কারো চোখে ধুলো দিতে পারলো না, তখন এই এ-বাড়ির মতো বাড়ির পিছন দিয়ে যে রেললাইন চলে গেছে সেখানে গিয়ে ভোর রাতে কাটা পড়লো।

মহামায়া বললেন, 'প্রাণ কি মানুষে সহজে দেয় নিবারণ। দুঃখ অসহ্য হ'লেই সেই চেষ্টা করে। খোঁজ নিলেই দেখতে পাবে তারও হয়তো এমন কোনো কষ্ট ছিলো—'

'তা ছিলো।' মাথা নাড়লো নিবারণ 'আমি তো সবই জানতাম। ভদ্রলোকের অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিলো, বৌ ছেড়ে তাকেই লুকিয়ে-লুকিয়ে বিয়ে করবার তালে ছিলো, সেটা জানতে পেরেই এই কাণ্ড করলো সে।'

সোমেন বললো, 'তাই বলো।'

ব্যস্ত হ'য়ে মহামায়া বললেন, 'কিন্তু এবার শুয়ে পড়ো সব। রাত

অনেক হয়েছে।'

নিবারণও ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, রাত অনেক হয়েছে বলার চেয়ে রাত প্রায় শেষ হ'লোই বলা যায়।' এ-কাঁধের ঝাড়ন ও-কাঁধে ফেলে চলে গেল সে। আর চলে যেতেই মহামায়া ছেলের দিকে তাকিয়ে গলা নীচু করলেন, 'শোন সমু, কুসুমকে সরাবার একটা বন্দোবস্ত ক'রে এসেছি।'

'কোথায়।'

'ও-বাড়িতে। ওরা আমাকে থাকতে বলেছিলো বাকী রাতটা। থাকবো কী, চিন্তায় ভাবনায় ভিতরে-ভিতরে যে আমার কী চলছিলো সে শুধু আমিই জানি। মেয়েটা একটু চোখ খুলে তাকাতেই চলে এলাম। তোর অসুখের কথা বলেই অবিশ্যি আসতে পারলাম। নয়তো ঐ অবস্থায় ফেলে আসা খুব দৃষ্টিকটু হ'তো। বড়ো বউর দেখলাম সর্দিজ্বর, মেজবৌ পোয়াতি, বৌমা নিতান্ত ছেলেমানুষ, আর এই বিশ্রী ব্যাপারটায় সকলেই কেমন মুষড়ে পড়েছে, একজন শক্ত-পোক্ত কেউ রমার কাছে থাকা একান্ত দরকার। আমি কুসুমের কথা বললাম। ওরা সবাই খুশিও হ'লো আশ্বস্তও হ'লো। বলে এসেছি আজ রাতটা তো থাকবেই, দরকার হ'লে কালও সারাদিন থাকবে।'

'খুব ভালো ব্যবস্থা করেছো।'

'বুঝলি না, ও-বাড়িতে থাকলে কাকপক্ষীও খুঁজে বার করতে পারবে না। সম্পূর্ণ নিরাপদ। তারপর কালকের মধ্যে বন্দোবস্ত ক'রে ভোররাত্তিরের ট্রেনে চলে যাবো।'

'সেই ভালো।'

'এখন দিয়ে আসাটাই যা মুশকিল। নিবারণকে দিয়ে তো পাঠানো যাবে না। যেতে হবে বাড়ির পিছন দিয়ে লুকিয়ে গোপনে। রেললাইন দিয়ে যদি ডাকরার মাঠ পার হ'য়ে চলে যায়, তা হ'লেই সবচেয়ে নিরাপদ।'

'আমিই দিয়ে আসছি।'

'তোকেই যেতে হবে। তুই এক কাজ কর, পিছনের গোলাবাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আয়, গিয়ে বলবে নিবারণদা দিয়ে গেল।'

'তা হ'লে আর দেরি ক'রে লাভ কী।'

'দাঁড়া, আগে আমি নেমে গিয়ে রাস্তাটা একবার দেখে আসি। বলা তো যায় না কোথায় কী বিপদ লুকিয়ে আছে।'

আস্তে মহামায়া নেমে গেলেন নিচে। সন্তর্পণে গেট খুলে ধু ধু নির্জন রাস্তায় এ-মাথা ও-মাথা, সামনে পিছনে টর্চ জ্বেলে-জ্বেলে খুব ভালো ক'রে দেখে নিলেন। তারপর উপরে এসে নিয়ে গেলেন ওদের। এগিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'সাবধানে যাস, লাঠি ঠুকে-ঠুকে চলিস, এ-সময়টা জীবজন্তুর বেরুবার সময়। টর্চটা রাখ।' তারপর 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলে কপালে হাত ছোঁওয়ালেন।

গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে আছে মফস্বল সহরের গাছে পাতায় ছাওয়া রাস্তাগুলো। তাবার আলোয় পথ দেখে পিছন দিক দিয়ে আস্তে-আস্তে রেললাইনের উপরে উঠে এলো ওরা। সাবধানে পা ফেলে চলতে লাগলো নিঃশব্দে। মাথার উপর অনন্ত আকাশের বিস্তার, রাত দুপোর ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া, নিস্তব্ধ পৃথিবী, জন-মনুষ্যহীন নিরালা পথ, বুকভরা ত্রাস, সমস্তটা মিলিয়ে কেমন অদ্ভুত লাগছিলো সোমেনের। যে-মেয়েটির জন্য সে এতো কাণ্ড করছে, পাশ ফিরে তাকিয়ে একবার তার আপাদমস্তক চাদর-জড়ানো মূর্তিটা দেখলো। এই মুহূর্তেও এই মেয়ে তার স্ত্রী বলেই পরিচিত। কোনো আগন্তুকের দেখা পেলেই তাড়াতাড়ি স্বামী সেজে দাঁড়াতে হবে, একটু আগে এই মেয়েই তার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলো, এখনো তার সেই কোমল নরম শরীরের বিচিত্র স্বাদ এক তীব্র চেতনা নিয়ে জ্বলছে শরীরের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে। ভেবে পেলো না এর চেয়ে আশ্চর্য, এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা আর কী ঘটতে পারে মানুষের জীবনে।

নিরাপদে ডাকরার মাঠ পাড়ি দিয়ে গোলাবাড়ির পিছনে এসে হাঁফ ছাড়লো।

ফিশফিশ ক'রে বললো, 'তা হ'লে আমি যাই ?'

কুসুম নিঃশব্দে মাথা নাড়লো।

'দালানটা ঘুরে গিয়ে ওদের সামনের দরজায় ধাক্কা দিয়ো, কেমন ?'

কুসুম মাথা নাড়লো।

'আর শোনো, আমি যে দিয়ে গেলাম তা কিন্তু বোলো না, মা ওঁদের কাছে বলেছেন আমার অসুখ, আমি শুয়ে আছি। মনে থাকবে ?'

'হ্যাঁ।'

'বোলো নিবারণদা দিয়ে গেছে।'

সব কথার জবাবেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ালো কুসুম।

চুপচাপ কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। মাথার উপর দিয়ে একটা পাখী উড়ে গেল ক্যাচক্যাচ করতে-করতে, একটা তারা খসলো, দূরে কোথায় হরিধ্বনির শব্দ উঠলো। যাবার জন্য পা বাড়ালো সোমেন। সহসা দ্রুত এগিয়ে এসে কুসুম প্রণাম করলো একটা, পায়ের পাতায় সোমেন তার চোখের জল অনুভব করলো। ফিরে আসতে-আসতে হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করলো সে।

॥ ২ ॥

রাত্রিজাগরণের ক্লান্তিতে, ঘুমটা সেদিন একটু গাঢ়ই হয়েছিলো সকলের। তার উপরে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে ঠাণ্ডা হয়েছিলো রাতটা। উঠতে বেলা হ'য়ে গেল। এমনকি মহামায়া পর্যন্ত ঘুম ভেঙে উঠে পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেলেন। সূর্যের আলো রীতিমতো প্রখর হ'য়ে উঠেছে। মনে পড়লো না কবে তিনি সূর্যোদয় না-দেখে দিন আরম্ভ করেছেন। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নিচে নেমে এলেন, নিবারণকে ডেকে দিলেন, ছোটু সিং উঠে ফটক খুললো।

ভেবেছিলেন চটপট স্নান ক'রে নিয়ে পুজোয় বসবেন। পুজো সেরে

বাজার দিয়ে সোজা চলে যাবেন ও-বাড়িতে। দেখে আসবেন রমা কেমন আছে। আসলে কুসুমকে দেখার জন্যই চঞ্চল হয়েছেন তিনি। এ-অবস্থায় পরের বাড়ি পাঠিয়ে শান্তি হচ্ছে না তাঁর। বোকা মেয়ে, কার কাছে কী বলতে কী বলে ফেলবে কে জানে!

কিন্তু বাগানে ফুল তুলতে এসেই দাঁড়িয়ে গেলেন। দেখলেন, কাঁচা-পাকা ছাঁটা চুলেব একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে অন্দরেব খিড়কি দবজায মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে-মেরে কী দেখছে। আর ফটকে দাঁড়িয়ে একটি জোয়ানমতো মাঝবয়সী পুরুষ ভিতবে ঢুকে যেতে ইসাবা করছে তাকে।

বাড়িব ভিতবে ঢোকবাব দুটো দবজা। একটা বসবার ঘরের বারান্দা দিয়ে, সেখান দিয়ে তাঁবা নিজেবা ঢোকেন অথবা বেরোন; আরেকটা নিবারণদের ঘর ঘেঁষে। সেটাই খিড়কি, চাকর-বাকরদের জন্য।

বারান্দার সিঁড়িতে পা রেখেই দৃশ্যটি দেখলেন মহামায়া। বলে উঠলেন, 'কে।'

'অ্যাঁ?' বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে মহামায়াকে দেখে থতমতো খেয়ে গেল, এবং পুরুষটি একটু আড়াল হ'লো।

'কী চাও এখানে?' সিঁড়ি থেকে নিচে নামলেন তিনি।

স্ত্রীলোকটি বৃদ্ধা হ'লেও রীতিমতো শক্তপোক্ত। নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি, ক্ষ'য়ে-যাওয়া কালো দাঁতে হেসে মাথা দুলিয়ে বললো, 'এই এটু দেইখছিলাম গো মা-ঠাকরুন।'

'কী দেখছিলে?'

'সে-মেয়েছেলেটা আছে নাকি।'

'মেয়েছেলে! কোন মেয়েছেলে?'

'সে হাবামজাদী আমার পুতের বৌ। আমাকে মেইরে ধইরে অক্ত বেইর কইরে পেইলেছিলো।'

স্থির হ'য়ে গেলেন মহামায়া। অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেন আর কথা

ফুটলো না মুখে। তবে কি এই কুসুমের শাশুড়ি। এই স্ত্রীলোকটিকেই সে খুন করেছে বলে তার বিশ্বাস? সেই খুনের ভয়েই কাল রাত্রিবেলায় তাঁরা অমন উন্মাদ হ য়ে দিক্‌ভ্রান্তের মতো ব্যবহার করেছিলেন?

'কী নাম তোমার ছেলের বৌয়ের?' সংযত হ'য়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

'কুসুম।'

'কুসুম! তা সে এখানে আসবে কী ক'রে? দেশ কোথায় তোমাদের?'

'হুই ধুপছাই গেরাম। খবর পেইয়ে আটকোশ পথ ঠেইঙে ছুইটতে-ছুইটতে এইয়েছি। খওনা হইয়েছি কি এখন, সেই ভোর আত্তিরে।'

'তোমাকে কে খবর দিলো যে তোমার ছেলের বৌ এখানে আছে।'

'ঐ তো. ঐ যে দেঁইড়ে আছে তোমার ফটকে।'

'তোমার ছেলে?

'আমার ছেলে!' বলেই বুক চাপড়ে আর্তনাদের সুর বার করলো স্ত্রীলোকটি, 'সে কি করে আছে গো মা, তাকে যে ওলাবিবি আজ তিনমাস হইয়ে গেল নিইয়ে গিইয়েছেন। হায় হায় গো, কী সোনার পরান আমার, কুথায় গেলো গো, বজ্জাত মাগী বেদবা হবার জন্যি কপাল কুইটতেছেলো গো, আজ যদি উয়ারে পাই ঘাড় মুইটকে অক্ত খাই। অরে আমার যুধিষ্ঠির রে, তুই আমারে ছেইড়ে কুথায় গেলি রে!'

হাজার হোক মা, তার শোক দেখে রাগ ভুলে মনটা নরম হ'য়ে গেল মহামায়ার। শান্ত ক'রে বললেন, 'কেঁদে কী করবে। ভগবানেরটা ভগবান নিয়েছেন। কিন্তু তোমার বৌর খোঁজ করছো কেন? ছেলেই যদি গেল তো বৌ দিয়ে আর করবে কী!'

'করবো কী? কী করি সে তখুনি দেইখে দেবো। একবার

বজ্জাত মাগীকে ধইরতি পারলে কি আর আমি ছাইড়বো ?' কুসুমের শাশুড়ির শোক নিমেষে অন্তর্হিত হ'লো. দাঁতে দাঁত পিষে দুই চোখে সে আগুন বার ক'রে ফেললো, 'কুথায়, ডাকো তাকে, না ডাইকলে আমি খানাতল্লাসি কইরে দেখবো তোমাব ঘর।'

মহামায়া রেগে গেলেন, 'কী বললে ? খানাতল্লাসি করবে !'

'অই ঘনশাম, কুথায় গেলি রে ড্যাকরা, অখন যে বড়ো গা লুকালি ? তুই বুলসি না কাল সাঁজবেলায় এক বেদবা মা-ঠাকরুনের সঙ্গে এই বাড়িতে ঢুইকতে দেইখেছিস।'

থামের আড়াল থেকে বিনীতহাস্যে মুখ বার করলো ঘনশ্যাম। কোঁকড়া-কোঁকড়া পরিপাটি চুল, ফতুয়া গায়ে, পান-খাওয়া লাল ঠোঁট। ব্যক্তিটি কে বুঝতে বাকী রইলো না মহামায়ার। আপাদ-মস্তক জ্বলে গেল তাঁর। তিনি অনায়াসেই অনুমান করতে পারলেন, এই লোকটাই কাল তাঁদের অনুসরণ করেছিলো। এই লোকটাই সেই লোক, যে কুসুমকে টাকা দিয়ে ভোগ করতে চেয়েছিলো। এখন এই মুহূর্তেও সেই লোভেই সে খুঁজতে এসেছে। আর এই বিকৃত-দর্শন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিও মেয়েটাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে এর কাছে জবাই করার আশাতেই খবর পেয়ে ছুটে এসেছে এতো দূর। গম্ভীর গলায় আদেশের সুরে বললেন, 'এদিকে এসো।'

'এই আসছি, মা।'

কাছে আসতেই মহামায়া ভিতরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে জোরে ডেকে উঠলেন, 'ছোটু সিং, নিবারণ—'

মহামায়ার ভঙ্গি দেখে লোকটা ঘাবড়ে গেল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভীরু গলায় বললো, 'আমার—আমার বোধকরি এট্টু ভুল হইয়ে গিইয়েছে—'

'ঠিক আছে, ভুলের শাস্তিটাও নিয়ে যাও।'

'অ্যাঁ।'

দাঁতন ক'রে কুয়ো থেকে জল তুলে মুখ ধুচ্ছিলো ছোটু সিং, বাইরে থেকে মহামায়ার ডাক শুনে দৌড়ে এলো, 'কী হইয়েছে, বৌমা ?'

'ফটক লাগাও।'

'কেন? কেন?' ঘনশ্যাম কেঁপে উঠলো।

'কেন তা এখুনি দেখতে পাবে।'

কুসুমের শাশুড়ি হঠাৎ দৌড় লাগালো একটা। 'হেই বুড়ি', বলে পথ আটকালো ছোটু সিং। তারপর গিয়ে ফটক লাগিয়ে দিলো।

'তুমি কুসুমের কে হও?' ঘনশ্যামের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন মহামায়া।

চোখ নামিয়ে নিয়ে কম্পিত গলায় ঘনশ্যাম বললো, 'আজ্ঞে মা-সাহেব, কেউ নই।'

মা-সাহেব শুনে মহামায়া তাঁর উদ্গত হাসিটা গিলে ফেললেন, বললেন, 'তবে তাকে খুঁজে বার করায় তোমার এতো কিসের গরজ?'

'এই বুড়ির জন্য।'

'বুড়ির জন্য? মিথ্যাবাদী। তোমাদের দু'জনকেই আমি পুলিশে দেবো।'

'অ্যাঁ।'

'ছোটু সিং!'

'জী, মা।'

'দাদাবাবুকে ডাকো, বলো, যে-লোক দুটোকে খুঁজছিলো তাদের পাওয়া গেছে। এখুনি থানায় গিয়ে পুলিশে দিয়ে আসুক। আর তার আগে তুমি এদের বেঁধে ঘরে আটকাও। এরা চোর, এরা বদমাস। এই বুড়ি মেয়ে বিক্রির ব্যবসা করে, আর এই লোকটা টাকা দিয়ে কেনে। ফাঁসি দেবার বন্দোবস্ত করবো আমি এদের।'

সরু-মোটা গলায় একটা কান্নার ঢেউ আছড়ে পড়লো বাতাসে। গোলমালে ঘুম-চোখে নিজে থেকেই নেমে এলো সোমেন, নিবারণও এলো। মহা এক হট্টগোল ব্যাপার।

শেষ পর্যন্ত ঘনশ্যামকে দু'চার ঘা দিয়ে বুড়িকে শাসিয়ে ফটক খুলে বিদায় দিলো ছোটু। মহামায়ার সারা মুখে একটি প্রসন্ন হাসি

ছড়িয়ে পড়লো। আস্তে বললেন, 'ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বরই করেন।'

সোমেন দৌড়ে চলে গেল কুসুমকে নিয়ে আসতে, ভুলে গেল তার মা কাল ও-বাড়িতে তাকে অসুস্থ বলে ঘোষণা ক'রে এসেছেন।

সবুর সইলো না। পথে আসতে-আসতেই উত্তেজিত গলায় সমস্ত ঘটনাটা সবিস্তারে সে শুনিয়ে দিলো কুসুমকে। এক নিশ্বাসে শুনতে শুনতে কুসুম যেন সহসা কোনো এক সুখদুঃখের অতীত জগতে এসে থমকে দাঁড়ালো। সব ভুলে কান্নার অনুভূতিটাই কেবল প্রবল হ'য়ে উঠলো তার।

বাড়ি এসে খুব সমারোহ ক'রে সকালের চা খাওয়া হ'লো আবার। আর তারপরেই সোমেন প্ল্যান করতে বসে গেল কুসুমের এই নবজন্মকে কী-ভাবে সেলিব্রেট করা হবে। নিবারণ নেচে-কুঁদে কুসুমের শাশুড়িকে নকল ক'রে দেখাতে লাগলো, ঘনশ্যামের গালে কী রকম বিরাশি শিক্কা ওজনের এক চড় কষিয়ে দিয়েছে সেটা বার-বার বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগলো ছোটু সিং। একটা মুক্তির আনন্দে ভ'রে গেল বাড়ির আবহাওয়া।

কুসুমের মুখ লাল হ'য়ে উঠতে লাগলো ক্ষণে-ক্ষণে। সে যেন একরাত্রির ব্যবধানেই হঠাৎ অনেক বড়ো হ'য়ে গেছে, শান্ত হ'য়ে গেছে, বিজ্ঞ হয়েছে।

॥ ৩ ॥

দিনের আরম্ভই যেখানে এমন এক চরম উত্তেজনা দিয়ে, তার শেষটাও নিশ্চয়ই সে রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর সেই বাঞ্ছা পূরণ করতেই বোধহয় বেলা প্রায় এগারোটার সময় সোজা গাড়ি ক'রে কলকাতা থেকে সমীররা এসে হাজির হ'লো। সমীর, কৃষ্ণা আর শর্মিষ্ঠা। সোমেন তাদের দেখে যেমনি অবাক তেমনি উচ্ছ্বসিত।

মহামায়াও খুশি হ'য়ে উঠলেন। ভাবলেন, সুখ যেদিন আসে

এমনি স্রোতের মতোই আসে। কাল কী গেছে। আর আজই বা কী।

আর শুধু কালই বা কেন? এমনিতেও তো কুসুমকে নিয়ে কম উদ্বেগ চলছিলো না তাঁর? আশ্চর্য! স্বামীটা পর্যন্ত ম'রে গিয়ে ওকে একেবারে মুক্তি দিয়ে গেল। নতুন জীবনে প্রবেশ করতে কোনো বাধা রইলো না।

সমীর, কৃষ্ণা আর শর্মিষ্ঠাকে তিনি সাদরে গাড়ি থেকে নামালেন। এদের কথা তিনি কতো শুনেছেন ছেলের কাছে, কতো উৎসুক ছিলেন দেখতে, এরাই ওর কলকাতার নিঃসঙ্গ জীবনে আনন্দের সঙ্গী। তাড়াতাড়ি আবার নতুন ক'রে বাজারে পাঠালেন নিবারণকে। কুসুমের সাহায্যে আবার নতুন ক'রে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় রান্নার বন্দোবস্ত করলেন। হাসিতে গল্পে মুখর হ'য়ে উঠলো বাড়ি। এর মধ্যে ওদের নিয়ে সহর বেরিয়ে এলো সোমেন। শর্মিষ্ঠাকে মেলা দেখিয়ে নিয়ে এলো। খেতে বসে কবে কলকাতা যাবে তার তারিখ ঠিক করা হ'লো। আর তারই এক ফাঁকে সোমেনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'য়ে শর্মিষ্ঠা জিজ্ঞেস করলো, 'মেয়েটি কে?'

সোমেন বললো, 'আমার মায়ের পুষ্যি।'

'মানে?' দৃষ্টি তির্যক করলো সে।

'মানে আমার মা মেয়েটিকে খুব ভালোবাসেন।'

'ও, আশ্রিত?'

পিছন থেকে এগিয়ে আসতে আসতে পিছিয়ে গেল কুসুম, সোমেনের জবাবটা আর শোনা হ'লো না।

দেখতে-দেখতে কেটে গেল দিনটা। বিকেলের ছায়া নামলো, ওদেরও ফিরে যাবার সময় হ'লো।

সোমেন তো বটেই, মহামায়াও অনেক ক'রে থেকে যেতে বলেছিলেন সেই রাতটা। কিন্তু ওরা পারলো না। একদিনের কড়ারেই কোনো এক বন্ধুর ব্যবসায়ী বাবার কাছ থেকে গাড়িটা

পেয়েছে, কাল বেলা দশটার মধ্যে ফেরৎ দিতে হবে। সারারাত না-চালালে ঠিক সময়ে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

তবুও না-খাইয়ে ছাড়লেন না মহামায়া, তুই উনুন জ্বালিয়ে আবার রান্নার বন্দোবস্ত করলেন। পথের জন্য টিফিন-কেরিয়ার ভর্তি লুচি মাংস দিলেন। রওনা হ'তে-হ'তে রাত প্রায় আটটা হ'লো।

সকাল থেকে একটানা একটা উত্তেজনার পরে চুপ হ'য়ে গেল বাড়িটা।

ভালোই লাগলো। মহামায়া বললেন, 'আজ আর দেরি না, যাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো সব।'

মহামায়া নিজে আর নিচে নামলেন না, কুসুমই খেতে দিতে এলো।

খেতে বসে এতোক্ষণে সোমেনের খেয়াল হ'লো সারাদিন এই মেয়েটিকে একদম ভুলে ছিলো সে। সারাদিন তার শর্মিষ্ঠার মনোরঞ্জনেই সময় কেটেছে। আর শর্মিষ্ঠাও ওকে তার কোনো আনন্দের সঙ্গী হিসেবে কখনো ডাকেনি। অথচ কুসুম আর সে সমবয়সী, বন্ধুতায় বাধা ছিলো না কোনো। তবে কি সে এটাই ধ'রে নিয়েছিলো যে এই অনাত্মীয় মেয়েটি এ-বাড়িতে আশ্রিত বলে অবহেলিত? কাজেই তাকে বন্ধুতার সম্মান দেয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠেনি তার মনে? ছি!

যদি ভেবে থাকে, খুব অন্যায়। খুব অন্যায়। কিন্তু আসল অন্যায়টা কি তার নিজের নয়? সে উদাসীন না-থাকলে কি ও এ-রকম অবহেলা করতে সাহস পেতো? তা নইলে শর্মিষ্ঠা কী হিসেবে ওর চাইতে এমন কিছু উৎকৃষ্ট?

মনটা খারাপ হ'য়ে গেল তার। অনুতপ্ত বোধ করলো। ইচ্ছে করলো কিছু বলতে, কিন্তু কেমন যেন অপরাধী মনে হ'লো নিজেকে, লজ্জা করলো, সংকোচ হ'লো। তা ছাড়া আজকের কুসুমের চেহারার সঙ্গে প্রত্যহের কুসুমের এমন কোনো মিল খুঁজে পেলো না, যার

জোরে সে সহজ হ'য়ে উঠতে পারে।

নিঃশব্দে খাওয়াদাওয়া সাঙ্গ ক'রে নিজের ঘরে এসে বসলো একটু। একটা সিগারেট খেলো, একটা ভারি মন নিয়ে শুতে এলো বিছানায়। আর শুয়েই অনুভব করলো, একটি অস্ফুট মৃদু সুগন্ধ অন্ধকারে অপেক্ষমানা নববধূর মতো ভীরু আবেগে জড়িয়ে ধরলো তাকে। বুকটা ধ্বক ক'রে উঠলো। বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে সেই অশরীরী গন্ধের কাছে নিজেকে ঢেলে দিলো সে। তার রোমাঞ্চ হ'লো। মনে-মনে বললো—কুসুম, আমার সারাদিনের সব ব্যবহারের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি কষ্ট পেয়ো না, রাগ কোরো না, আমি কাল সকালের আলোয় তোমার সব বেদনা ধুয়ে দেবো।

আর কুসুম এতোক্ষণে নিজের সঙ্গে একা হ'য়ে চুপচাপ জানালায় এসে দাঁড়ালো। সারাদিন যেন সে কিসের ঘোরে আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলো। মনে হ'লো কোথায় যেন একটা বড়ো রকমের গোলমাল হ'য়ে গেছে। একটা প্রবল ঝড়ের দাপটে জগতের এক প্রান্ত থেকে যেন আর-এক প্রান্তে এসে ছিটকে পড়েছে সে।

নিজেকে তার অত্যন্ত অসহায় লাগলো। তার ভয় করলো। একটা দুঃসহ কষ্ট পাক দিয়ে উঠলো বুকের ভিতরে।

কিন্তু কিসের কষ্ট? আজ তো তার কোনো কষ্টের দিন নয়। আজ তার মুক্তির দিন। আজ তার পুরোনো খোলস একেবারে খসে গেছে জীবনের মতো। এখন শুধু নতুন আশা, নতুন দিন, নতুন আলো।

কিন্তু সেই নতুনের চেহারা কেমন? শর্মিষ্ঠাকে মনে পড়ে গেল তার, তার দাদাবাবুর ছাত্রী শর্মিষ্ঠা, যাকে নিয়ে উনি আজ সারাদিন সব ভুলে ছিলেন।

কুসুম ঢোঁক গিললো। কুসুম আকাশের তারা গুনলো। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—অসংখ্য। কে কবে গুনে শেষ করতে পেরেছে এদের। এরা সব মৃত মানুষ, কুসুম শুনেছে মৃত্যুর পরে মানুষেরা

আকাশে গিয়ে ঐ রকম একটি একটি তারা হ'য়ে ফুটে থাকে। তাহ'লে কতো কোটি মানুষ মরেছে! হিসেব নেই তার। জন্মালেই তো মরতে হবে। আজ না হোক, কাল। তারপর ঐ তারা। সুন্দর। সে-ও মরে গেলে নিশ্চয়ই ঐ রকম একটা তারা হ'য়ে তাকিয়ে থাকবে। সে সবাইকে চিনবে, কিন্তু তাকে কেউ চিনতে পারবে না।

একটু-একটু ক'রে রাত বাড়লো, পৃথিবী নিঝুম হ'য়ে গেল, ঘরে ঘরে ঘুমের নিশ্বাস গভীর হ'লো, কুসুম তেমনি দাঁড়িয়ে থাকলো জানালায়। আর তারপর হঠাৎ কোন কোণা থেকে লাফ দিয়ে উঠে এলো লাল দগদগে এক ভাঙা চাঁদ। এসেই রাগী চোখে স্থির হ'য়ে তাকিয়ে রইলো কুসুমের দিকে।

আর তারও পরে ভোর হ'লো। সুন্দর শীতল ভোর। ভোরের মোছা-মোছা ছাই রং ঢেকে দিলো সেই রাঙা ভাঙা চাঁদ। ঠাণ্ডা হাওয়া আদর বুলোলো মুখে।

বাদাম গাছের ঘনপত্র ডালপালা কাঁপিয়ে নড়ে-চড়ে উঠলো পাখিরা, উড়লো আকাশে, কাক ডাকলো। মহামায়ার ফুলে ভরা বাগান থেকে একটা মদির গন্ধ উঠে এলো বাতাসে। ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবসন্ন কুসুম এতোক্ষণে বিছানার কাছে এগিয়ে এলো, আর দাঁড়াতে পারছিলো না সে। কিন্তু বুক ভ'রে একটা নিশ্বাস নিতে গিয়েই চমকে উঠলো। বাতাসে ভেসে-আসা সেই মদির গন্ধ থমকে দিলো তাকে। এ-গন্ধ কার? কিসের? এ-গন্ধ তার মনে কোন নাম-না-জানা সুখের বেদনাকে বয়ে নিয়ে এলো!

বুঝেছে। সে বুঝেছে। সব বুঝেছে। আজ নিজেকে তার কেন অপরিচিত লাগছে, কেন সে শুতে এসেও শুতে পারেনি, কেন জানালায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ভোর হ'য়ে গেল, সব স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেয়েছে সে। তার সমস্ত ঝাপসা অনুভূতিকে প্রখর ক'রে এই গন্ধই তাকে সেইখানে নিয়ে এসেছে যেখানে দাঁড়িয়ে কাল তার জীবনের সব-কিছু ওলোটপালোট হ'য়ে গেছে। যেখানে দাঁড়িয়ে কাল তার

লাঞ্ছিত নিপীড়িত যৌবনের সমস্ত মলিনতা ধুয়ে তাকে এক প্রবল ভালোবাসার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

এ গন্ধ নয়, গন্ধ নয়। এ তার দেহে-মনে প্রথম পুরুষের স্পর্শের স্বাদ। এ তার সর্বনাশ।

সর্বনাশ। সর্বনাশ। এ আমার সর্বনাশ। দাদাবাবু, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসি। তোমার ছাত্রী শর্মিষ্ঠার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী ভালোবাসি। এই ছাখো, সে-কথা আমি কী ভয়ংকর চিৎকার ক'রে বলছি। আমার চিৎকারে আকাশ ফেটে গেল, কিন্তু তুমি পাশের ঘরে শুয়েও তা শুনলে না।

আমি জানি, তুমি শুনবে না। কোনোদিন শুনবে না। আর কোনোদিন আমার জীবনে কালকের রাত্রি ফিরিয়ে আনবে না তুমি। তোমার সেই বুকের আশ্রয়, সেই উত্তাপে ভরা গলার স্বর, চোখের সেই আকাশ-পাতাল আলোড়ন-করা দৃষ্টি আর কোনোদিন খুঁজে পাবো না আমি। আমি বুঝেছি, আমি কুসুম। আমি নিতাই কৈবর্তের মেয়ে, যুধিষ্ঠিরের বিধবা স্ত্রী। তোমরা আমাকে করুণা ক'রে ভালোবাসো, দয়া ক'রে ভালোবাসো, শর্মিষ্ঠার মতো ভালোবাসো না।

কুসুমের বঞ্চিত ক্ষুধিত হৃদয় জুড়ে এক অশ্রুত অব্যক্ত বেদনার বোবা সমুদ্র উথালপাথাল ক'রে উঠলো। আর তার বিছানায় শোয়া হ'লো না। ছটফটিয়ে নেমে এলো সে নিচে। সে জানে ফটক বন্ধ। কাঁটাতারের বেড়ায় শরীরটাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে প্রথম দিনের মতোই বেরিয়ে এলো বাইরে। মহামায়ার কথা ভেবে বুকটা বিদীর্ণ হ'য়ে গেল তার। মা কাঁদবেন। সে জানে তিনি ছাড়া আর-কেউ নেই তার জন্য কাঁদবার। দুঃখটা তাঁকেই দিতে হ'লো। মা গো, আমাকে তুমি ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। ঘুমের কুয়াসা-মোড়া বাড়িটা ঝাপসা হ'য়ে গেল চোখের জলে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে সে রেললাইনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

সিগন্যাল ডাউন হয়েছে, ভোর চারটের লোক্যাল ট্রেণটা পূর্ণবেগে এগিয়ে আসছে কাছে, ঠাণ্ডা কঠিন ইস্পাতের অন্তরে তার প্রতিধ্বনি তরঙ্গ হ'য়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরে। নিবারণদার বর্ণিত সেই বৌটি কেমন ক'রে রেলের তলায় মাথা দিয়েছিলো ভাবতে চেষ্টা করলো, আর সেই সময়টুকুর মধ্যেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো ট্রেনটা। একটা উন্মত্ত ক্ষিপ্ত নিষ্ঠুর ভয়'ল জানোয়ারের মতো দুটো লাল চোখ জ্বালিয়ে ছুটে গ্রাস করতে এলো তাকে। পায়ের তলায় স্পষ্ট মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব ক'রে বাঁচবার শেষ আকাঙ্ক্ষায় মরীয়া হ'য়ে চিৎকার ক'রে উঠলো কুসুম। তীব্র তীক্ষ্ণ হুইসলের শব্দে কোথায় ভেসে গেল সেই আর্তরব।

* * *

ভোব রাত্রিরের ভাসা-ভাসা ঘুমে পাশ ফিরতে গিয়ে খুট ক'রে দরজা খোলার ছোট্ট একটু শব্দেই চোখ মেলে তাকালো সোমেন। বুঝতে পারলো সে যেন চ'লে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে চাদর-ঢাকা একটি অস্পষ্ট ছায়াও চোখে পড়লো তার। সদ্য জাগ্রত অর্ধচৈতন্য নিয়ে কয়েক মুহূর্ত থমকে পড়ে রইলো সে। তারপরেই বুঝতে পারলো চোর। মফস্বল সহরে এই ধরনের চোরের উৎপাত কিছু নতুন নয়। ঘটি বাটি বা রোদে শুকুতে দেয়া কাপড়-চোপড় চুরি তো প্রত্যহের ব্যাপার। সুকৌশলে ঘরে ঢুকে রাত্রির অন্ধকারে গৃহস্থের সর্বস্বাপহারী চোরের সংখ্যাও নগণ্য নয়। কাল সকলেই ব্যস্ত ছিলো, অন্যমনস্ক ছিলো, ক্লান্ত ছিলো। কে জানে কোন সুযোগে ঢুকে পড়ে সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে ছিলো; এখন পালাচ্ছে সব নিয়ে। কিছু শিক্ষা দেয়া দরকার। এইবার সোমেন ঘুম ঝেড়ে লাফিয়ে উঠে বসলো। দরজার কোণ থেকে একটা লাঠি হাতে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। মারতে হবে পিছন দিক ...ক আচমকা। তারপর জাপটে ধরতে হবে। চ্যাঁচামেচি করলেই ...াবে।

কিন্তু দেরি হ'য়ে গেছে, ততোক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে সেই মূর্তি। দ্রুত পা চালালো, ব্যবধান কমিয়ে এনে রান্নাঘরের পিছন দিয়ে ঠিক তার মতো ক'রেই কাঁটাতারের ঝোপ ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলো। আর বেরিয়ে এসেই টের পেলো এই চোর কোনো পার্থিব জিনিস চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে না তাদের বাড়ি থেকে, নিজেকে নিয়েই চলে যেতে চাইছে এই জীবন থেকে, জগৎ থেকে।

সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে ত্রাসে সকল গা ঘেমে উঠলো তার। 'শোনো। শোনো। কী করছো?' দু' হাত তুলে সে ছুটে এলো। পরিষ্কার বুঝতে পারলো আর রক্ষা নেই। এক মুহূর্ত ভেবে পেলো না কী করবে। তারপরেই জীবন পণ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়লো লাইনের উপর; লম্বা চুলের বেণীটা ধ'রে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এলো এ-পাশে। ট্রেনের হাওয়ার ঝাপটা উল্টোদিকের ঢালুতে গড়িয়ে দিলো তাদের।

অনেক পরে চোখ তুলে তাকালো কুসুম। চোখে চোখ রেখে সোমেনও তাকিয়ে রইলো। তার বুঝতে বাকী রইলো না কিছু। লাইন পার হ'তে-হ'তে শান্ত গলায় বললো, 'বাড়ি গিয়ে গুছিয়ে ফেলো সব, আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই কলকাতা যাবো।'